তেপান্তর পার হয়ে

পূর্বভারতীয় রূপকথা

কথক
দেবব্রত ঘোষ

তেপান্তর পার হয়ে

অমরাবতীর কন্যে

ফুরিয়ে যাওয়ার কথা

*

একালের বাচ্চাদের জন্যে

সেকালের রূপকথা

*

কথক ঃ

দেবব্রত ঘোষ

প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্র ঃ

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি উপন্যাস, একটি গল্প এবং একটি পুচ্ছাংশের কাহিনী নিয়ে চিরকালীন রূপকথার এই আসর। নিজের সংস্কারের শিকার এক রাজা তাঁর প্রকৃতিপ্রেমী পুত্র-বধূকে হত্যা করেছিলেন। তারপর শোকে দুঃখে পাথর হয়ে এক বিধ্বংসী, আগ্রাসী, উষর রূপ নিয়ে হাহাকারে আতংকিত করেছিলেন সবাইকে। তাঁরই মুক্তির কাহিনী উপন্যাসটিতে।

চিরাচরিত পন্হায় বিশ্বাসী নন তরুণ রাজকুমার। রাজলক্ষ্মীর আশীর্বাদ নিয়ে নানান্ বাধা পেরিয়ে খুঁজে পেলেন মনের মত কন্যে। দ্বিতীয় কাহিনীটিতে সেই রোমান্টিক উদ্ঘাটন।

অবশেষে আমার কথাটি ফুরলো। ফুরলেও কিন্তু থেকে যায় জীব ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে সহজ যোগসূত্র। পারস্পরিক নির্ভরতার, স্নেহমমতার কথা, হয়ত বা কোন সামাজিক রহস্যও।

→

তেপান্তর পার হয়ে

— পূর্ব ইউরোপের রূপকথা —
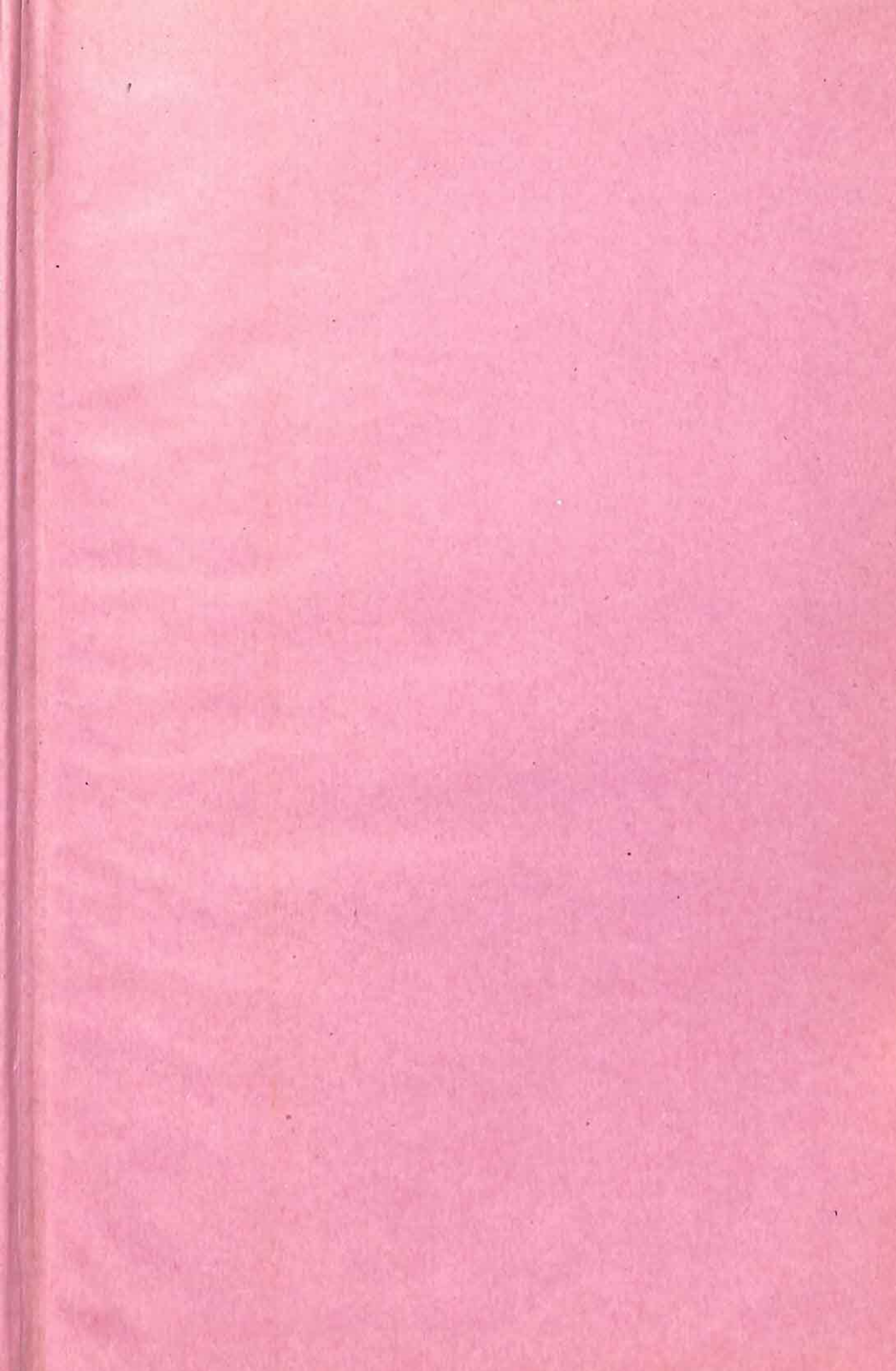
লেখকের পরবর্তী প্রকাশন ঃ

দেশবিদেশের রাক্ষস খোক্কস

নানান্ দেশের উপকথা

কেউ ছোট নও

তেপান্তর পার হয়ে

অমরাবতীর কন্যে ঃ ফুরিয়ে যাওয়ার কথা

পূর্বভারতীয় রূপকথা

কথক ঃ দেবব্রত ঘোষ

প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্র ঃ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
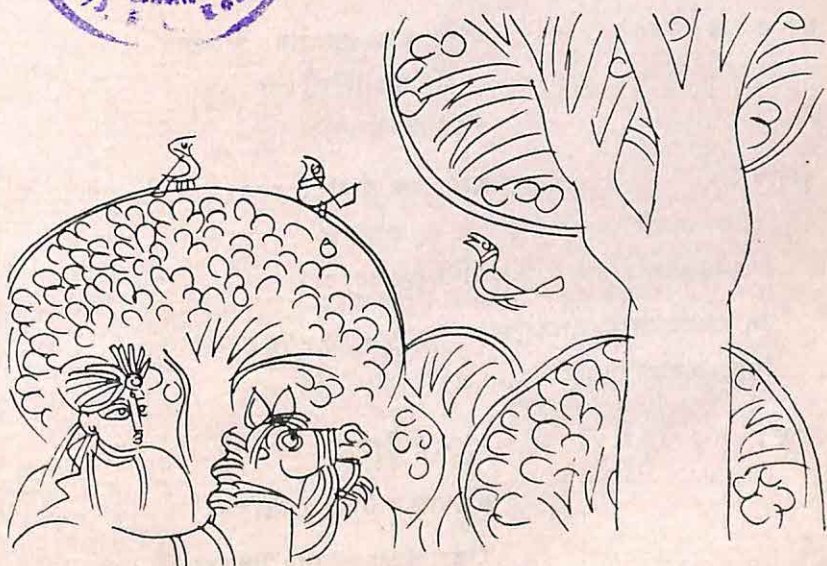
TEPANTAR PAR HOYE
Folk Tales from Eastern India
Told by Debabrata Ghosh

ISBN 81 - 85109 - 89 - 3

First Published 1988

প্রকাশক : কবিতা ঘোষ
পূলা পাবলিকেশন্‌স্
সিসি-জে/১/৭/৬
সল্ট লেক (বিধান নগর)
কলকাতা-৭০০ ০৬৪

সহযোগী প্রকাশক
ও পরিবেশক : নয়া প্রকাশ
২০৬ বিধান সরনী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক : দরবারী উদ্যোগ
গঙ্গানগর, ২৪ পরগনা (উত্তর)

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : প্রসেস এ্যাণ্ড এ্যালায়েড গ্রাফিক্‌স্
১২ প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন
কলকাতা-৭০০ ০১২

বাঁধাই : শান্তি বুক বাইণ্ডিং ওয়র্কস
১/৪ মধু গুপ্ত লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা এ্যাকাডেমির গ্রন্থপ্রকাশ অনুদান প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত।

দাম : পনের টাকা
বাংলাদেশ টাকা : তিরিশ
US $ 4·50 £ Stg 2·90 net

মনমাতানো গল্পবলা

শ্রদ্ধেয় বড়জ্যাঠামশাই

৺ভূপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-এর

পুণ্যস্মৃতিতে নিবেদিত

ধন্যবাদ!

প্রয়াত বলাইমামা, সুরপতি নন্দী, মমতা ঘোষ,
সর্বশ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ সাহা, ডি.পি.রায়,
বারীন মিত্র, কৃষ্ণা নিয়োগী, কবিতা ঘোষ,
বাংলা অ্যাকাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ
এবং
চোখ বড় বড় করে আমার গল্প শোনা
ছোট বড় সব বন্ধুকে

কোন্ পৃষ্ঠায় কী?

গোড়ার কথা ঃ মা-বাবার জন্যে

।। ১ ।।

বর্তমানে অচল 'আগামী' পত্রিকায় এই সংকলনের লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬-৬০ সালে। বই হিসেবে প্রকাশ করার ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠেনি এতদিন। একটা কারণ, দীর্ঘদিন দেশান্তরী ছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগিতায় এক প্রজন্মেরও বেশী কাল পরে লেখাগুলো পুঁথিবদ্ধ করতে পেরে আনন্দিত। একালের শিশুরা পছন্দ করলে আরও আনন্দিত হব। ভরসা এই, গল্পগুলো চিরকালীন। এদের আবেদনও তাই।

চিরকালীন রূপকথার চিরন্তন আবেদন, এটা কি কথার কথা? কী আছে ওই রূপকথায়? রাজপুত্তুর, রাজকন্যে, আদ্ধেক রাজত্ব। সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না। সেটা ত শেষের কথা। আসল গপ্পো সেই সুখের জন্যে লড়াই। প্রতীক্ষা। সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি। রাক্ষস-খোক্ষস। প্রাণ ভোমরা। ডাইনীর মায়া। গাছ-পালা, জল-আকাশ, পাখি-পাখাল, জন্তু-জানোয়ারের জগতে এক হয়ে যাওয়া। বন্ধুত্বের সাহায্য। লোভের, হিংসের শাস্তি। মন্ত্র। ইচ্ছাপূরণ। সুয়োরানী, দুয়োরানী। সৎ-মা সৎ-ভাইবোনদের হিংসে। ষড়যন্ত্র। মরে মরেও বেঁচে ওঠা। রাক্ষসের পেট থেকে। ভূত-প্রেতের কবল থেকে। গাছ-গাছড়া, মাছ, কুমীর, বাঁদর, টিয়ে এমন কি পাথরের রূপ থেকেও মুক্তি পাওয়া। অনেক সাহস। অনেক বিপদ-আপদ, ভোগ-ভোগান্তি। সব শেষে শান্তি। রাজপুত্তুর রাজকন্যের মিলন। সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না।

সেকালের জগৎ, সেকালের পল্লী পরিবেশে রূপকথার সৃষ্টি। মানুষের চিন্তা, সংস্কার, বিশ্বাসের জগতে লৌকিক-অলৌকিকের সীমারেখাটা তখন ছিল দুর্বল। সেকালের রূপকথায় সব ঘটন অঘটন মানুষের ইচ্ছাপূরনের সমস্ত উপাদান নিয়ে সহজভাবেই খাপ খেয়ে গেছে। সেকালের বড়রাও শিশুদের সঙ্গে সমান আনন্দ পেয়েছেন রূপকথায়। যদিও কল্পনা-বিস্তার ও ইচ্ছাপূরণের প্রয়োজনে বড়দেরও নিজস্ব রূপকথা ছিল। আজও আছে। তবে আজকের উচ্চকোটির সাহিত্যধারার যুগে বড়দের উপভোগ্য সেই সব লৌকিক রূপকথা হয়ে গেছে ব্রাত্য। বটতলার সাহিত্যও যার তুলনায় অনেক ঘষা-মাজা।

সেকালের বড়রাও শিশুদের সঙ্গে সমান আনন্দ পেয়েছেন রূপকথায়। যদিও কল্পনা-বিস্তার ও ইচ্ছাপূরণের প্রয়োজনে বড়দের নিজস্ব রূপকথা ছিল।

পশ্চিমের দেশে ওই ধরনের 'অমার্জিত' লৌকিক কাহিনীর বহু সংকলন ও ভাষ্য আছে। আমাদের দেশে ছাপার অক্ষরে তাদের দেখা পাওয়া আজও অকল্পনীয়। এদেশে রূপকথা শুধু শিশুভোগ্য ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তার একটা কারণ, শিশুর মনোজগৎ একাল-সেকাল সবকালেই আদিম জনসমাজের মত। শিশুর মনেও অলৌকিক-লৌকিক, অবাস্তব-বাস্তব, কল্প রাজ্যের

সীমারেখাটা নিরর্থক। ইচ্ছাপূরণের প্রয়োজনটাই বরং প্রবল। প্রাচীন রূপকথা সে প্রয়োজন মেটায়।

তাছাড়া সারা দুনিয়াটাই শিশুর চোখে গোলমেলে, উল্টো-পাল্টা। একই সঙ্গে ভালমন্দের অবস্থান বা সাদা-কালোর মিশ্রণ তার ভাবনায় আসে না। হয় সব ভাল, না হয় ত সব খারাপ। শিশুর জগতে এর মাঝামাঝি কিছু নেই। পরিবেশকে সঠিকভাবে বুঝবার আগে এই চেতনাই প্রাথমিক। আমরা বড়রাও ত অনেক সময় মানুষের বিচারে, পরিস্থিতির বিচারে ওমনি শিশুসুলভ একপেশে চিন্তা করি। বন্ধুর দোষ দেখি না, বিরূপ পরিস্থিতি বা মানুষকে অন্ধকারময় ভাবি।

হয় সব ভাল, না হয় ত সব খারাপ। শিশুর জগতে এর মাঝামাঝি কিছু নেই। পরিবেশকে সঠিকভাবে বুঝবার আগে এই চেতনাই প্রাথমিক।

।। ২ ।।

আজকের শিশুদের কাছে রূপকথা বলার কতকগুলো সমস্যা আছে। বিশেষ করে গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে আমাদের পরিবেশের অনেক অদল-বদল হয়েছে। ইস্কুল-কলেজ এবং সাক্ষরের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। গোচারণ ভূমি এখন দুর্লভ। রাখাল বা বাগাল ছেলেরাও এখন সীমিত। সেই ঢেঁকির চলন আর নেই। চাষের কাজে সেচ আর যন্ত্রপাতির ব্যবহার অনেক বেড়েছে। বাঘ-ভালুক এখন সংরক্ষিত জংগলে অথবা চিড়িয়াখানায়। জল-জংগলের পরিধি কমেছে। সাপ-খোপের উৎপাতও।

সেই রাজা-জমিদাররা নেই। সতীনের সংসারও নেই তেমন। সুয়োরানী-দুয়োরানী এখন শিশুর ধারণার বাইরে। সেই গল্পবলা দাদু-দিদারা নিতান্তই অনুপস্থিত।

গল্পের ভাষা? তাও পালটেছে। আগে বাংলার প্রান্তীয় ভাষার একটা বিশেষ জায়গা ছিল রূপকথায়। জন-শিক্ষার প্রসার এবং ট্রানজিস্টর রেডিও-র কল্যাণে বাংলাভাষা অনেক সমতল এখন। প্রাচীন রূপকথায় সেই অনুষংগ, সেই চিত্রকল্প, সেই ধ্বনিবৈচিত্র্য এখন অনেকখানি অচেনা আজকের শিশুদের। বড়দের কাছেও। শুধু শহরে নয়, গ্রামেও। কোথায় সে খুঙ্গি-পুঁথি, ঢোল-ডগর, ছাই-নাতা, আগর-বাগর?

এদিকে শিশু এবং প্রাক-কিশোর সাহিত্যের বিপুল প্রসার হয়েছে। ছোটদের পত্র-পত্রিকার দাম এবং প্রচার সংখ্যা দেখলে বুঝতে পারা যায়। দেশি-বিদেশী রং-চং ছবি-ভরা গল্পের বই এবং কমিক্‌স-এর প্রবল প্রতাপ এখন। রেডিও-টিভিও শিশুর দৃষ্টিভংগী, রসবোধকে অন্যতর, খরতর করেছে।

এ যুগের রূপকথায় তাই চিত্রকল্প এবং ভাষার পরিবর্তন দরকার। এই কমিক্‌স-এর যুগে আবার শুধু চিত্রকল্প দিয়ে বাচ্চাদের মন মাতানো মুস্কিল। তাই প্রচুর ছবির ব্যবহার

চাই। যে ছবি শিশুর কল্পনাকে খর্ব করবে না। শুধু ফোটোগ্রাফধর্মী হবে না। সম্ভবত
লৌকিক চিত্রকলার ধাঁচে প্রায় দ্বিমাত্রিক ছবিই উপযুক্ত হবে। শিল্পীরা বলতে পারবেন।

এযুগের রূপকথায় চিত্রকল্প এবং ভাষার পরিবর্তন
দরকার। এই কমিক্স্-এর যুগে আবার শুধু চিত্রকল্প
দিয়ে বাচ্চাদের মন মাতানো মুস্কিল। তাই প্রচুর
ছবির ব্যবহার চাই। যে ছবি শিশুর কল্পনাকে খর্ব
করবে না। শুধু ফোটোগ্রাফ-ধর্মী হবে না।

গল্প বলার ভঙ্গীতেও পরিবর্তন কাম্য। অবন ঠাকুরের লেখা ছবির যে গতি, যে ছন্দ তা
কি সব সময় দাদু-দিদাদের কথন শৈলীতে পাওয়া যায়? ওঁর লেখার স্বাদ যে পেয়েছে, তাকে
কি পুরনো রীতিতে তেমন করে টানতে পারা যাবে আর?
একটানা অনেক কথা, দীর্ঘ বাক্যবিন্যাস বিষয়বস্তু উপলব্ধিতে বাধা দেয় শিশুদের।
ছোট ছোট বাক্য গঠন তাই প্রয়োজন। সুর ও ছন্দের ব্যবহার এই উপলব্ধিকে গভীর
করবে। ছড়া না হোক, ছড়ার ছন্দ যেন ব্যবহার করা হয়। গদ্যরীতিতেও। ধ্বনি-মাধুর্যের
প্রয়োজনে কিছু অপ্রচলিত, এমনকি ভারি শব্দও ব্যবহার করা চলে। অবন ঠাকুরের তুরুপের
তাস সেখানেও। বিশেষ করে ক্ষীরের পুতুলকে মনে রেখে বলছি।
এসব গল্প মূলত শোনাবার জন্যে। পড়িয়ে শোনাবার সময় কথনের ভঙ্গী, চোখ, মুখ,
হাতের ভাষা ব্যবহার করা চাই। আট ন বছর থেকে ওরা নিজেরাই পড়তে পারবে ভালভাবে।
আবার কাহিনী বিন্যাসে, গল্পের জট পাকাতে খুলতে নাটকীয়তার পুরো অবকাশ যেন
থাকে। গল্প কোথাও ঝুলে গেলে চলবে না। গল্প শেষের প্রশান্তিতে শিশু যেন ঘুমতে যায়,
তার আগে নয়।

এসব গল্প মূলত শোনাবার জন্যে। পড়িয়ে শোনাবার সময়ে
কথনের ভংগী, চোখ, মুখ, হাতের ভাষা ব্যবহার করা চাই।

।। ৩ ।।

এদিকে রূপকথা উপকথার কথকদের এক বিপদে ফেলেছেন আজকালকার কিছু
মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ।
পুরনো রাজতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় উদ্ভূত গল্পগুলো নাকি আধুনিক সমাজের
শিশুদের ব্যক্তিত্ব খর্ব করতে পারে। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের
খুব সাবধানে থাকতে হয়। এই সময়ে অশিক্ষা-কুশিক্ষার জের সারা জীবন ধরে চলতে
থাকে। পুরনো রূপকথাগুলো সেই কুশিক্ষাই নাকি দেয়।
একটা উদাহরণ:
বাচ্চারা যদি শেখে রাজপুত্তুর-রাজকন্যেরা অনেক বিপদ এবং কাণ্ড-কারখানার শেষে

বিয়ে করল এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল, তাতে নাকি তাদের বিবাহিত জীবন অবাস্তব হয়ে উঠতে পারে। বিয়ের আগে পাত্র বা পাত্রী পছন্দ করার চেয়ে বিয়ের পর মানিয়ে গুছিয়ে চলার সমস্যা আজকের সমাজে অনেক বেশী--এই কাণ্ডজ্ঞানটি ওদের মনের কোণে কোণে থাকে না। রূপকথার রাজপুত্তুর-রাজকন্যের অভাবে ওদের বাস্তব বিবাহিত জীবন নাকি ব্যর্থ হয়ে যায়।

পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হয়। এই সময়ে অশিক্ষা-কুশিক্ষার জের সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। পুরনো রূপকথাগুলো নাকি সেই কুশিক্ষাই দেয়।

সব মনোবিজ্ঞানী শিক্ষাবিদ্‌রাই কিন্তু শিশুশ্রাব্য গল্পের সমাপ্তি চান প্রশান্তিতে। সে হিসেবে গল্পের একটা পর্যায়ের পর সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করার প্রয়োজন খুব। বিয়ের পর সবারই কিন্তু শান্তিতে কাটে না। দৈত্য-রাক্ষস, দুষ্টু রানী, রাক্ষুসী রানীকে কিন্তু পুঁতে অথবা অন্যভাবে মেরে ফেলা হয়। আসল কথা ভাল লোকেরা শেষ পর্যন্ত ভালভাবে থাকে। দুষ্টু লোকেদের বেলায় হয় উল্টোটি।

তবে এটা ঠিক, জাতপাঁত নিয়ে সংস্কার এবং বিদ্বেষ সৃষ্টিতে পুরনো রূপকথা-উপকথার অবদান কম নয়। চালাক নাপিত কিম্বা বোকা কুমোর বা তাঁতীর গল্পের মাধ্যমে শিশুর মনে জাতপাঁত বিদ্বেষ দানা বাঁধে অজানতে। চালাক শেয়াল এবং বোকা ছাগল কিম্বা গাধাদের বরং কাজে লাগানো যায়। সামাজিকভাবে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা সেখানে নেই।

জাতপাঁত নিয়ে সংস্কার এবং বিদ্বেষ সৃষ্টিতে পুরনো রূপকথা-উপকথার অবদান কম নয়। চালাক নাপিত কিম্বা বোকা কুমোর বা তাঁতীর গল্পের মাধ্যমে শিশুর মনে জাতপাঁত বিদ্বেষ দানা বাঁধে।

বেশিরভাগ মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্ কিন্তু রূপকথা বলার প্রবল পক্ষপাতী। শিশুরা গল্প ভালবাসে। বিশেষ করে রূপকথার গল্প। এর কারণ বিশ্লেষণ করেই তাঁরা রূপকথার বিশেষ সমর্থক হয়েছেন। ভাষা, রূপকল্প ইত্যাদি পরিবর্তিত হোক এতে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু রূপকথার কাহিনী শিশুর মানসিক শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক বলেই তাঁরা মনে করেন।

সব যুগের সব শিশুই মানসিকভাবে একই সমস্যার মুখোমুখি হয়। তাঁদের মতে চিরকালীন রূপকথায় সেই সব সমস্যার জবাব রয়েছে। অতি সাধারণ গল্পের মধ্যেও রয়েছে ভীষণ সমস্যার সহজ সমাধান। আবার গল্পগুলো মা-বাবা, দাদু-দিদাকেই বলতে হবে। এমন কি নার্সারি, কিণ্ডারগার্টেন, প্রাইমারি ইস্কুলের দিদিমণি অথবা গৃহশিক্ষকদের হাতেও সবটা ছেড়ে দিলে চলবে না। Loco Parentes তত্ত্ব এখানে চলবে না। কেন সে কথায় আসছি।

একটি শিশু বাবা-মা-বড়দের আদরে আশ্রয়ে বাড়ছে। তার শারীরিক শ্রীবৃদ্ধির জন্যে খাদ্য, ব্যায়াম, বিশ্রাম, ওষুধ এসব চাই। মানসিক শ্রীবৃদ্ধির জন্যে চাই ভালবাসা, স্নেহস্পর্শ, নিরাপত্তা, কল্পনার জগতে ইচ্ছেপূরণ, মানসিক চাপ ও দ্বন্দ্বের, অপরাধবোধের কাল্পনিক অবসান।

কিন্তু এইসব চাপ, দ্বন্দ্ব, বোধ ইত্যাদির কারণ কি? এদের অবসানটাই বা কাল্পনিক হতে যাবে কেন?

শিশুর মানসিক চাপ, দ্বন্দ্ব এবং অপরাধবোধের কারণ কিন্তু সবই সামাজিক। যে সমাজে শিশু জন্মেছে, তার একটা চাহিদা আছে, প্রয়োজন আছে তার মূল্যবোধ সঞ্চারের। এটা কোর না, ওটা নিও না—নানান বাধা, নানান নিষেধ। না মানলে বাবা-মায়ের ভালবাসায়, আশ্রয়ের নিরাপত্তায় বুঝি চিড় ধরে।

অথচ প্রবৃত্তির চাড়ও ত কম নয়। শিশু স্বমেহন করতে চায়। বড়দের সমাজে এটা 'নিষিদ্ধ' এবং ঢাকা-ঢাকির ব্যাপার। এখানেই পত্তন তার অপরাধবোধের।

আবার ছেলে যখন মাকে, মেয়ে যখন বাবাকে পুরো দখল করতে চায়, সেখানেও হতাশা। অসামাজিক ইচ্ছাপূরণে ব্যর্থতা। ফের শিশুর নিরাপত্তাবোধে ফাটল। ফলে, ছেলে এবং মেয়ের অবচেতন মনে বাবা অথবা মায়ের মৃত্যুকামনা—অপরাধবোধের বৃদ্ধি।

বাড়িতে এল ছোট ভাই অথবা বোন। তাকে নিয়ে সবার ব্যস্ততা। আপাত দৃষ্টিতে তার নিজের ব্যস্ততাও কম নয়। তবু অবচেতনে তার নিরাপত্তাবোধে বিরাট আঘাত। নিজেকে পরিত্যক্ত মনে হয়, স্নেহের ভাগীদারকে খুন করতে ইচ্ছা হয়।

এইসব 'পাপ' চিন্তা শিশুর মনে হয় অনন্য। ছোট ভাই-বোনকে বাবা-মা-বড়রা বুঝি বেশি ভালবাসেন। তবে কি তার মনের ইচ্ছেটা বড়দের কাছে ধরা পড়ে গেছে? ভাই-বোন সম্পর্কে তার হিংসাটা তীব্র হয়। অপরাধবোধটাও জোরদার হয়ে ওঠে।

সৎমা সৎ-ভাইদের অত্যাচারের এবং পরাজয়ের কাহিনী আসলে শিশুর পারিবারিক এবং আত্মিক সমস্যার সমাজগ্রাহ্য সমাধান।

আবার দৈত্য-দানো, রাক্ষস-খোক্ষস-ডাইনিও শিশুর মানসিক সমস্যার সামাজিক প্রতিফলন। তার সমাধানও সেই দৈত্য-রাক্ষস ইত্যাদির পরাজয়ে এবং মৃত্যুতে।

শিশুর মনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অপরাধবোধ, ভয় ইত্যাদির অনেকখানি ওষুধ আছে চিরকালীন রূপকথায়। অন্য হাজার ধরণের শিশুসাহিত্য সৃষ্টি হলেও তাই রূপকথার জবাব নেই, বিকল্প নেই।

বড়রা শিশুর কাছে দৈত্যের মত। তাদের সব অনুশাসন শিশুর অবচেতন মনে বিদ্রোহের ভাব আনে। গল্পের মধ্যে দিয়ে দৈত্যদের জব্দ করতে পারলে শিশুর আত্মতৃপ্তি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

বাড়িতে একক শিশুরও এই অপরাধবোধ থেকে নিস্কৃতি নেই। বাবা-মায়ের প্রশংসিত প্রতিবেশী বা আত্মীয় শিশুদেরই প্রতিপক্ষ মনে করা হয়।

বাবা-মায়ের কাছে এসব গল্প শুনবার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। দৈত্য-রাক্ষস, সৎমা, সৎ-ভাই-বোনদের পরাজয়ে বাবা-মায়ের অনুমোদন পাওয়া বিশেষ জরুরি। সুতরাং ইস্কুলের উপর পুরো নির্ভর না করে বাচ্চার মা-বাবারা নিজেরাই তাদের গল্প শোনাবেন—মনোবিজ্ঞানীদের একবাক্যে উপদেশ।

সুতরাং শিশুর মনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অপরাধবোধ, ভয় ইত্যাদির অনেকখানি ওষুধ আছে চিরকালীন রূপকথায়। বাহ্যিক যুক্তি, বাস্তবতা, অবাস্তবতা এসব কোন ব্যাপারই নয়। অন্য হাজার ধরনের শিশুসাহিত্য সৃষ্টি হলেও তাই রূপকথার জবাব নেই। বিকল্প নেই।

উত্তরের দেশে দেশে এসব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অজস্র সংকলন বেরিয়েছে নানান দেশের রূপকথার। তাদের ভাষ্যগুলোও বিশাল।

বাংলা সাহিত্যে আজও তেমন কিছু হলো না। কবে হবে জানি না।

সব দক্ষিণের দেশেই এই দশা। অর্থনীতির মত এ ব্যাপারেও উত্তরের উপরই নির্ভরশীল।

অথচ বাংলার রূপকথার বিশ্লেষণ জর্মন, রাশিয়ান বা আমেরিকানরা যে ঠিকমত করতে পারেন না, প্রচুর নিষ্ঠা এবং পাণ্ডিত্য থাকলেও অনেক ফাঁক-ফোকর থেকে যায়, সেটা বাঙ্গালীরা বুঝলে, গবেষণার কাজে নিজেরা এগিয়ে এলে মঙ্গল।

তবে শুধু বাঙ্গালী এই সুবাদে যেন নিষ্ঠা ও বৈদগ্ধ্যে ফাঁকি না পড়ে।

আশাকরি, বর্তমান সংকলনে শিশুর ব্যক্তিত্ব হানিকর কোন কাহিনী নেই এবং নির্ভয়ে সংকলনটি পাঁচ-মাইনাস শিশুদেরও শোনানো চলবে।

গ্রাম-বাংলার, দেশ-বিদেশের প্রাচীন রূপকথা-উপকথা সংগ্রহ করা ছাড়াও, আমার ছেলেবেলায় প্রচুর রূপকথা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় জ্যাঠামশাই-এর কথা মনে পড়ে। বাংলায় আরব্য রজনীর মত গল্পের মধ্যে গল্পের খনি ছিলেন তিনি।

বর্তমান সংকলনের প্রথম কাহিনীটি বহুল-প্রচারিত কাঠামো থেকে একটু আলাদা। খুলনা জেলার এক অজ গাঁয়ে আমার এক সম্পর্কিত বলাইমামার মুখে শোনা। দ্বিতীয় গল্পটি জ্যাঠামশাই-এর। তাঁর বাচন ভঙ্গীটি বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। তৃতীয় কাহিনীটিও চিরকালীন। পুচ্ছাংশকে অবয়ব দিয়েছি শুধু।

১ বৈশাখ, ১৩৯৫

তেপান্তর
পার
হয়ে

॥ এক ॥

নিঝুম অন্ধকার।

গাছের পর গাছ। গাছ আর গাছ। আকাশ-ঢাকা গাছের দল।

শুধু অন্ধকার।

রাজপুত্র বলেন, কি হবে?

মন্ত্রীপুত্র বলেন, তাই ত।

সদাগরপুত্র বলেন, কি করি?

কোটালপুত্র বলেন, তাই ত।

রাত বাড়ে। অন্ধকার আরও ছম্‌ছম্‌। পাখি-পাখালির ডাক নেই। জন্তু-জানোয়ারের সাড়া নেই। নড়লে চড়লে শুকনো পাতাগুলো শুধু মচমচ করে। চমকে উঠতে হয়।

কোটালপুত্র বলেন, কেন মরতে এলি? শুধু শুধু এই বনের ভিতর?

রাজপুত্র বলেন, দুর, তাতে কি? কেমন মজা হল, বল ত?

কি সুন্দর অন্ধকার!

কিন্তু যদি বাঘ-ভালুক আসে? সদাগরপুত্র বলেন। সাপে ছোবল দেয়?

হানা দেয় ভুত প্রেত, রাক্ষস-খোক্‌কস?

মন্ত্রীপুত্র রেগে যান। তাতেই বা কি? যুদ্ধ করতে পারব না? তলোয়ার নেই আমাদের? এত যদি ভয়, এলি কেন?

সদাগরপুত্র, কোটালপুত্র গম্ভীর হয়ে যান।

এক কাজ করি। ডেকে বললেন মন্ত্রীপুত্র। আয় গাছের উপর রাত কাটাই।

সবাই মিলে ঘুমোলে চলবে না। একজন একজন করে জাগব।
রাজপুত্র সায় দেন। তাছাড়া বনটাও সুবিধের নয় মনে হচ্ছে। একটা জানোয়ারের ডাকও কই শুনতে পেলাম না। রাতজাগা পাখি, ঝিঁ ঝিঁ পোকা, ব্যাঙ কোন কিছুর সাড়া নেই। অদ্ভুত।
কিন্তু ঘোড়াগুলোর কি হবে? সদাগরপুত্র বলে ওঠেন।
কোটালপুত্র ভরসা দেন। একটু ফাঁকা পেলেই ঠিক আকাশে চড়ে বসবে বিপদ বুঝলে। পক্ষীরাজ ত।

একে একে সবাই উঠলেন গাছে। চারটি বড় বড় ডাল। পাশাপাশি। চারজনে হেলান দিলেন। পাশে রইল পাগড়ি। হাতে রইল তলোয়ার। জুতোগুলো গাছের নিচে। ঠিক হল রাজপুত্র আগে জাগবেন।
আর সবাই ঘুমোলেন। রাজপুত্র একা জেগে রইলেন।
বেশ লাগছে। ঘুমন্ত বন্ধুরা। নিঃশ্বাসের শব্দ ফোঁস ফোঁস। অন্ধকার যেন ভুত হয়ে বসে আছে। বসে বসে ফোঁস ফোঁস করছে। ভয় দিচ্ছে।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। রাজপুত্র বসে আছেন, বসেই আছেন। হঠাৎ বাতাস উঠল ঝির ঝির করে পাতা কাঁপিয়ে। চাঁদ উঠল চুপ চুপ করে আকাশ ঝাঁপিয়ে। অন্ধকার ফিকে হল। রাজপুত্র চেয়ে চেয়ে চাঁদ দেখতে চেষ্টা করলেন। দেখা যায় না। ঘন গাছের পাতা। তার আড়ালে শুধু একটু চিক চিক। হঠাৎ চমকে উঠলেন রাজপুত্র। দূরে কিসের শব্দ না? ধড়ফড়, ছটফট? চিঁ হিঁহিঁ? তাঁর পক্ষীরাজ আদরের মত আওয়াজ না? সবগুলো পক্ষীরাজ এবার ডেকে উঠল। শব্দটা মিলিয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে দূরের আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর শোনা যায় না।
রাজপুত্র সোজা হয়ে বসলেন। ফিকে ফিকে অন্ধকারে ভালো করে চোখ মেলে দিয়ে। হাতে রইল তলোয়ার। শক্ত মুঠোয় ধরা।
মড়মড় মড়মড়। পাতা মাড়িয়ে কে একজন যেন আসে। এ দিকেই। মস্ত একটা ছায়ার মত। রাজপুত্র শক্ত হয়ে বসলেন। বন্ধুদের ডাকব? ভাবলেন

একবার। নাঃ, দেখি কি হয়। মড়মড়। ছায়াটা আসছে। এল এক গাছতলায়। দাঁড়াল। নড়ে না। চড়ে না। দাঁড়িয়েই রইল। সেই কি হয়, কি হয় ভাবটা নেই আর। একঘেয়ে লাগছে। ছায়াটা দাঁড়িয়েই আছে। গাছের একটা গুঁড়ির মত। রাজপুত্রের ঘুম পেয়ে গেল।

ছায়াটা হঠাৎ নড়ে উঠল। বাড়িয়ে দিল একটা হাত। হাতে চকচকে হাড়ের মত কি একটা জিনিষ। সুর করে চেঁচিয়ে উঠল ছায়াটা :

হাং ঢাং থাং ডাং ঠকাঠক ঠা।

ভাং বাং ফাং পাং ঘটাঘট টা।

গমগম করে উঠল বনটা।

তারপরেই খটাখট আওয়াজ। যেন অনেক নুড়ির ঠোকাঠুকি। আবার চুপচাপ। তেমনি করে দাঁড়িয়ে থাকা, দাঁড়িয়েই থাকা।

আবার ঘুম পেয়ে গেল রাজপুত্রের। চুপি চুপি ডাকলেন মন্ত্রীপুত্রকে। ছায়াটার দিকে নজর রাখিস। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

মন্ত্রীপুত্র চোখ রগড়ে উঠে বসলেন।
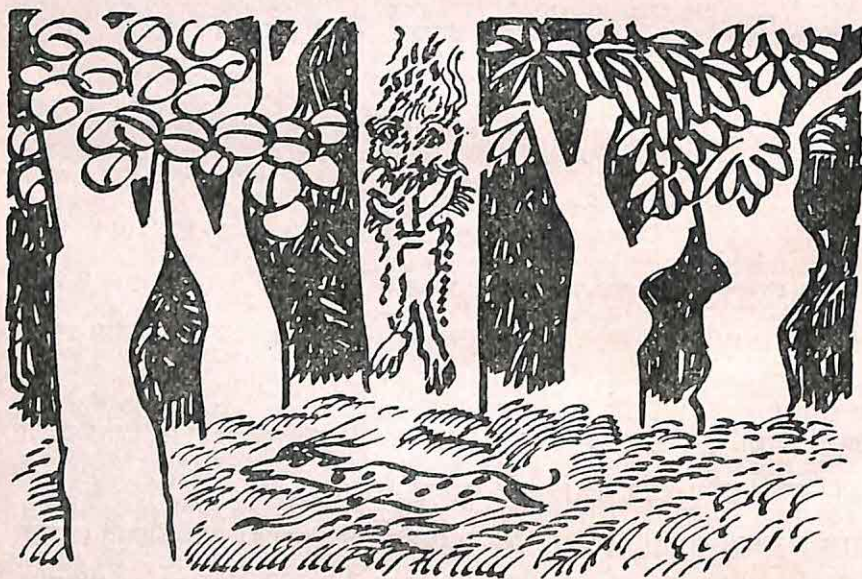
গাছের গুঁড়ির মত ছায়া

ছায়াটা নড়ে না চড়ে না। দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়েই আছে। গাছের একটা গুঁড়ির মত। সামনে এককাঁড়ি হাড়।
মন্ত্রীপুত্র বসে আছেন। হাতে রয়েছে তলোয়ার। শক্ত মুঠোয় ধরা।
হঠাৎ সুর করে চেঁচিয়ে উঠল ছায়াটা:

ঝুপ সুপ বক তফ তক পফ তা।
ধুস ফুস জব ছপ দচ পছ থা॥

গমগম করে উঠল বনটা।
তারপর সপ সপ আওয়াজ। যেন কুকুরের জল খাওয়া।

আবার চুপচাপ। তেমনি করে দাঁড়িয়ে থাকা। দাঁড়িয়েই থাকা।
ঘুম পেয়ে গেল মন্ত্রীপুত্রের। চুপিচুপি ডাকলেন সদাগরপুত্রকে।
ছায়াটার দিকে নজর রাখিস। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।
ছায়াটা নড়ে না, চড়ে না। দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়েই আছে। গাছের একটা গুঁড়ির মত। সামনে কিসের স্তুপ। সাদাসাদা কালোকালো।
সদাগরপুত্র বসে আছেন। হাতে রয়েছে তলোয়ার। শক্ত মুঠোয় ধরা।
হঠাৎ সুর করে চেঁচিয়ে উঠল ছায়াটা:

ধা গৈ হা ধৈ জৈ চৈ ঝাঃ।
না তৈ মা থৈ সৈ রৈ জাঃ॥

গমগম করে উঠল বনটা।
তারপরই ঘস ঘস আওয়াজ। যেন কাস্তে দিয়ে ধান কাটা।
আবার চুপচাপ। তেমনি করে দাঁড়িয়ে থাকা, দাঁড়িয়েই থাকা।

ঘুম পেয়ে গেল সদাগরপুত্রের। চুপিচুপি ডাকলেন কোটালপুত্রকে।
ছায়াটার দিকে নজর রাখিস। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

কোটালপুত্র চোখ রগড়ে উঠে বসলেন। ছায়াটা নড়ে না, চড়ে না। দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়েই আছে। গাছের গুঁড়ির মত। সামনে একটা মরা হরিণ পা ছড়িয়ে। কোটালপুত্র বসে আছেন। হাতে রয়েছে তলোয়ার। শক্ত মুঠোয় ধরা। হঠাৎ সুর করে চেঁচিয়ে উঠল ছায়াটা :

পড় তড়াপড় কুর কুরাকুর কটাং মটাং ছট।
টর থড়াটর টুর টরাটুর ধমপটা তক খট॥

গমগম করে উঠল বনটা।
তারপরেই তড়পড় আওয়াজ। যেন বাঁশের বনে আগুন।
মরা হরিণটা জ্যান্ত হয়ে গেছে। ছুট দিয়েছে চটপট।

ততক্ষণে আকাশে ভোর। কোটালপুত্র স্পষ্টই দেখলেন, ছায়া মূর্তিটা একটা রাক্ষসের। বড় বড় দাঁত। বড় বড় শিং। মাথাটা জালার মত।
সেও ছুট দিয়েছে। হরিণের পিছুপিছু।
হরিণ হেরে গেল। ধরা পড়ল রাক্ষসের হাতে। একটানে তার ঘাড় মটকালো রাক্ষস। কচমচ, কচমচ। হরিণটাকে খেয়ে বনের ভিতর কোথায় মিলিয়ে গেল।

ভোরের আকাশে আলো। নিঝুম বনেতে আলো। কোটালপুত্র অবাক হয়ে রাক্ষসটার কথা ভাবেন।

॥ দুই ॥

র হল।

আরও ভোর হল।

রাজপুত্ররা নিচে এলেন।

পক্ষীরাজগুলো কোথায়?

চারদিকে খোঁজাখুজি। কোথাও নেই। রাক্ষসের ভয়ে তাহলে পালিয়ে গেছে। উড়ে গেছে। এখন? হেঁটে হেঁটে চল এই নিরালা বনে। আকাশে ওড়ার মজা মাটি হল।

তা না হয় হল। কিন্তু এখন কোন দিকে যাওয়া যায়? চারদিকে শুধু বন আর বন। ঘন ঘন গাছ আর লতাপাতা।

ওরা একটা গাছের নিচে বসল। গোল হয়ে। ভেবে চিন্তে ঠিক ঠাক করতে হবে। কি করা যাবে।

কাল রাত্তিরের কথা মনে পড়ছে? রাজপুত্র জিজ্ঞেস করলেন।

সেই গা-ছমছম করা অন্ধকার। সবারই মনে পড়ল। সেই গাছের নিচে ছায়ার মত রাক্ষস। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ কি যেন বলে।

রাজপুত্র উঠলেন। এক টুকরো হাড় খুঁজে নিয়ে ফিরলেন। একটা ম্যাজিক দেখাব তোদের। এই হাড়খানা থেকে অনেক হাড় করে ফেলব। রাজপুত্র বললেন।

রাজপুত্র বাড়িয়ে দিলেন হাতটা। চেঁচিয়ে উঠলেন সুর করে:

হাং ঢাং থাং ডাং ঠকাঠক ঠা।
ভাং বাং ফাং পাং ঘটাঘট টা॥

গমগম করে উঠল বনটা।

তারপরেই হাড়ের খটাখট আওয়াজ। অনেক হড়ের ঠোকাঠুকি।

এত হাড়? কোথ্থেকে এল?

আকাশ থেকে পড়ল?

মাটি ফুঁড়ে বেরুল? কেউ কিছু বুঝতে না বুঝতেই হাড়ের ঢিপি এত বড় হয়ে গেল।

আমিও ম্যাজিক দেখাব। এই হাড়ে রক্ত মাংস লাগাব আমি। মন্ত্রীপুত্র বললেন। সদাগরপুত্র এগিয়ে বসলেন। উৎসুক হয়ে।

মন্ত্রীপুত্র সুর করে চেঁচিয়ে উঠলেন:

ঝুপ সুপ বক তফ তক পফ তা।
ধুস ফুস জক ছপ দচ পছ থা॥

গমগম করে উঠল বনটা।

তারপরেই সপ সপ আওয়াজ। যেন কুকুরের জল খাওয়া।

এত রক্তমাংস কোথ্থেকে এল?

আকাশ থেকে ঝরল?

মাটি ফুঁড়ে বেরুল?

কেউ কিছু বুঝতে না বুঝতেই হাড়ে হাড়ে রক্তে মাংসে মস্ত এক স্তুপ হয়ে গেল।

আমিও ম্যাজিক দেখাব। এই রক্ত মাংস হাড় দিয়ে মরা জানোয়ার বানাব আমি। সদাগরপুত্র বললেন।

কোটালপুত্র এগিয়ে বসলেন। উৎসুক হয়ে।

সদাগরপুত্র সুর করে চেঁচিয়ে উঠলেন:

ধা গৈ হা ধৈ জৈ চৈ ঝাঃ।
না তৈ মা থৈ সৈ রৈ জাঃ॥
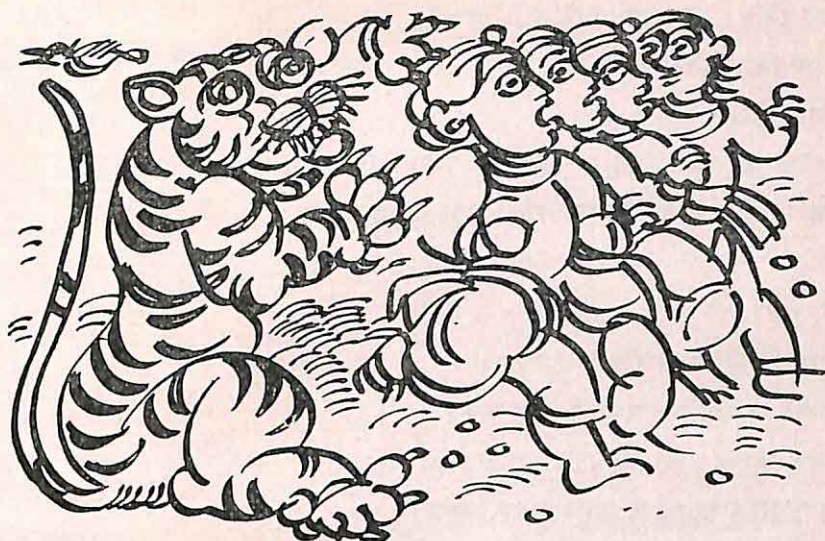
গমগম করে উঠল বনটা।

তারপর ঘসঘস আওয়াজ। যেন কাস্তে দিয়ে ধান কাটা।
সেই থলথলে স্তুপের জায়গায় একটা মরা বাঘ পড়ে আছে।
অবাক কাণ্ড।
শিউরে উঠল সবাই। বাঘটা যেন এইমাত্র মরে গেছে। কি চকচকে ডোরাকাটা গা।

আমিও ম্যাজিক দেখাতে পারি। মরা বাঘটাকে বাঁচাতে পারি আমি। বললেন কোটালপুত্র।
থাক। ঢের হয়েছে। কাজ নেই আর কেরামতি দেখিয়ে। তুমি বাঘটাকে বাঁচাও, আর আমরা তার পেটে ঢুকি আর কি। মন্ত্রীপুত্র বলেন।
বাঃ তোমরা সবাই ম্যাজিক দেখালে, আমি বুঝি বাদ পড়ব? রাক্ষসের মন্তরটা খাটে কিনা দেখব না? কোটালপুত্র খুঁত খুঁত করেন।

ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে মরবি নাকি? তারচেয়ে চল বনের বাইরে যাবার চেষ্টা করে দেখি। সদাগরপুত্র উঠে দাঁড়ালেন।

সবাই মিলে হাঁটতে সুরু করেছেন। এমন সময় সেই বাঘটা, মরা বাঘটা জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।

কোটালপুত্র কখন মনে মনে আউড়ে ফেলেছিলেন মন্তরটা।

বাঘটা বেঁচে উঠেই হালুম করে তাড়া করল ওদের।

ছুট, ছুট।

রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র একদিকে ছুটলেন।

সদাগরপুত্র-কোটালপুত্র আর একদিকে।

বাঘের পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শুকনো পাতার শব্দ উঠছে মচমচ। তার উপর বাঘের আওয়াজ, হালুম, হুলুম, এলুম।

গাছপালা, লতাপাতা, বনবাদাড় এড়িয়ে, পেরিয়ে, ডিঙ্গিয়ে রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র ছুটছেন, ছুটছেন। ছুটতে ছুটতে একটা গাছের গোড়ায় এসে আটকে গেলেন।

আর যাবার জো নেই।

এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়।

সব্বনাশ।

মন্ত্রীপুত্র তাড়াতাড়ি করলেন কি, গাছটির উপর চড়ে বসলেন। দেখাদেখি রাজ-পুত্রও। দুজনে বসে হাঁপাচ্ছেন। হাত পা ছড়ে গেছে। জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে। রাজপুত্রের গলার রত্নহারও গেছে খসে।

কিন্তু বাঘটা গেল কোথায়? বনের মধ্যে হারিয়ে গেল নাকি? কিম্বা খেয়ে ফেলল সদাগরপুত্র-কোটালপুত্রকে?

ভেবে আর কি হবে? যা হবার হয়েছে। আগে একটু জিরিয়ে নি, পরে খোঁজ-খবর করা যাবে ওদের। আমরা ত এখন বেঁচে গেলাম। বললেন মন্ত্রীপুত্র।

॥ তিন ॥

রাজপুত্র চেঁচিয়ে উঠলেন।

আরে, ওইখানটায় বন শেষ হয়ে গেছে।

দূরে এক মাঠ আর বাড়িঘর।

তাই নাকি? মন্ত্রীপুত্র গাছের আরও উপরে ওঠেন।

সত্যিই ত। একটু সামনে থেকেই ছোটখাট ঝোপঝাড় সুরু হয়েছে। বড় গাছ অনেক কম। পাতার আড়াল থেকে মাঠ দেখা যায়। চাষের ক্ষেত। দু-চারখানা চালাঘরও।

পাতার আড়াল থেকে

দুজনে গাছ থেকে নেমে পড়লেন। সাত তাড়াতাড়ি। যেন নতুন করে বল পেয়েছেন ফিরে। হনহন করে হেঁটে হেঁটে দুজনে হাজির হলেন। বনের ধারে গ্রামখানায়।

তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে।

তারপর সাতদিন সাতরাত কেটে গেল। এই সাতদিনে তাঁরা অনেক গ্রাম, অনেক মাঠ, অনেক নদী পার হলেন। অনেক বাড়িতে অতিথি হলেন। যেখানেই গেছেন আদর করেছে সবাই। যত্ন করেছে অচিন দেশের মানুষের। রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন। রাজ্যের লোকজন কাজকর্ম করছে ত, ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করছে ত, তবু তাদের মনে আনন্দ নেই। কিসের যেন দুঃখ। কিসের যেন ভয়।

রাক্ষসেরা অত্যাচার করে?

ভুত-প্রেত জ্বালাতন করে?

বাঘ-ভালুক জন্তু-জানোয়ার হামলা করে?

ভিন্ দেশের শত্রুরা চড়াও হয়?

না সেসব কিছু না। জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলে,

তোমরা বিদেশী। আমাদের দুঃখ তোমরা বুঝবে না। রাজার পাপে আমাদের দুঃখ। রাজার পাপে রাজ্যের সর্বনাশ।

রাজা কি লোকেদের উপর জুলুম করেন? মারধোর করেন? জেলে পোরেন? শূলে চড়ান? হয়রান করেন অযথা?

না সেসব কিছু না। রাজা খুব ভালো লোক। তবু রাজ্যের লোকেরা বলে, রাজার পাপে আমাদের দুঃখ, রাজার পাপে রাজ্যের সর্বনাশ।

কি পাপ, কেউ বলে না। কিম্বা জানে না।

মন্ত্রীপুত্র যুক্তি দেন চল রাজধানীতে যাই। সেইখানে নিশ্চয়ই সব জানতে পারব।

সাতদিন সাতরাত পর। ওঁরা রাজধানীতে এসে গেলেন। দূর থেকে দেখা যায়
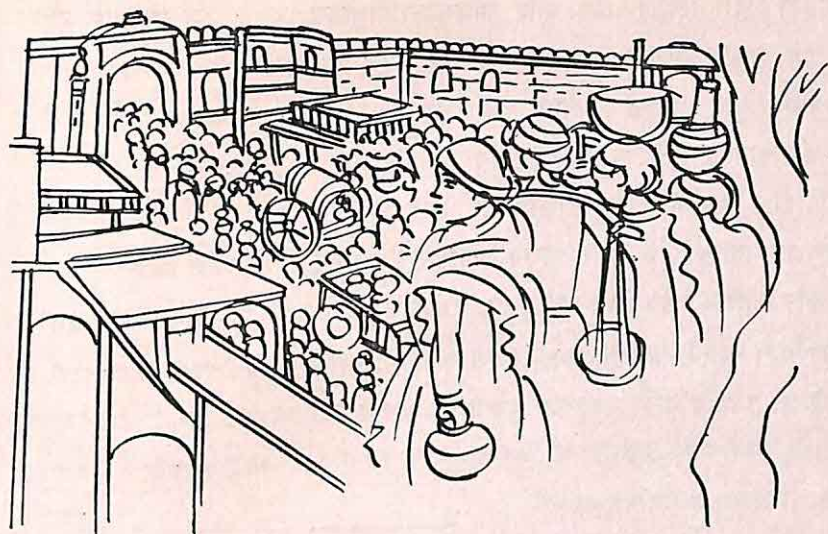
রাজধানীর বাজারে

উঁচু উঁচু পাঁচিল। গম্বুজ। পাঁচিলের ধার দিয়ে খাল। রাজপুত্ররা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন। খালের উপর পুল। ওপারে পাঁচিল ছাড়িয়ে এতবড় এক সিংদরজা। দুইপাশে দুই পাথরের সিংহ। হাঁ করে আছে। যেন গিলে ফেলবে। দরজার পাশে কত সেপাই। তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে। কেউ বা ঘোড়ার উপর। হাতির পিঠেও।

রাজধানীর বাজারেও লোক চলেছে। পায়ে হেঁটে। গাধার পিঠে। কেউ বা গরু কিম্বা ঘোড়ার গাড়িতে। নানান জিনিষ নিয়ে। শাক-সব্জী, ফল-ফুল, ঘি-দুধ, কাপড়-চোপড় কত কি।

রাজপত্র-মন্ত্রীপুত্র সিংদরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

সেপাইরা পথ আটকালো। কে গো বিদেশি তোমরা? কোথায় তোমাদের ঘর?

রাজধানীতে কিসের কাজ? তোমাদের পরিচয়পত্র কই?

আমরা গান্ধার দেশের রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র। দেখা করব তোমাদের রাজার সঙ্গে।

পরিচয়-পত্র আমাদের হারিয়ে গেছে পথে।

সেপাইরা হেসে ওঠে। এই বুঝি রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্রের বেশ? সে পোষাক কই? কই সে মুকুট, মেখলা, সোনার পাদুকা? কই বা পক্ষীরাজ ঘোড়া?
রাজপুত্ররা পথে তাঁদের বিপদের কথা বলেন। সেপাইরা তবু হেসে লুটোপুটি। গল্প বানাবার জায়গা পাওনি? ওসব চালাকি চলবে না। কেটে পড়। পরিচয়হীন বিদেশীর স্থান রাজধানীতে নেই।

রাজপুত্রের চোখে জল এসে পড়ে। সামান্য সেপাইও তাঁদের অপমান করল? চুপ করে খালের ধারে এসে বসেন রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র। নতুন উপায়ের কথা ভাবেন দুজনে বসে বসে। রাজার সঙ্গে দেখা না হলে, রাজধানীতে যেতে না পারলে ত কিছুই জানা যাবে না। ছদ্মবেশে ঢুকব? এদেশী লোকের মত হয়ে? সেপাইদের অনুরোধ করব আর একবার? অন্তত একটিবার রাজার কাছে খবরটা জানাতে? আচ্ছা কোটালপুত্র-সদাগরপুত্র যদি এখন এসে পড়ত? ঘুরতে বেড়াতে বেশ মজা হত। ওদের কি হল কে জানে। বেঁচে আছে কি মরে গেল। এখান থেকে গান্ধার দেশ কতদুর? কোন দিকে? কতদিনে যাওয়া যায়? বাড়িতে মা-বাবা, চাকর-বাকররা এখন কি করছে? তারা কেউ জানেনা আমরা এখন কোথায়। হয়ত কত ভাবছে। সাতপাঁচ নানান কথা বলাবলি করেন দুজনে। রাজধানীতে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়ার যাতায়াত চলতে থাকে। আগের মতই।

গল্প বানাবার জায়গা পাওনি

॥ চার ॥

হঠাৎ সেপাইদের সাজ সাজ রব।

কি ব্যাপার? না, রাজা আসছেন। নিজেই ঘোড়া ছুটিয়ে। ভাবতে না ভাবতেই রাজামশাই-এর ঘোড়া এসে থামল। থামল সিংহদ্বারে।

দুজন বিদেশী এসেছিল? একটু আগে? রাজামশাই জিজ্ঞাসা করলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে।

ঝট করে সিপাইরা হ্যাঁ না কিছু বলতে পারে না।

নিশ্চই এসেছিল। আমি স্বপ্ন দেখেছি। দুজন বিদেশী এসে দাঁড়িয়ে। রাজধানীর দরজায়। কে যেন বললে, ওরাই তোর বিপদ দূর করবে। ওদের নিয়ে আয়। আদর-যত্ন কর।

সেপাইদের দলপতি এগিয়ে এল। অভিবাদন করল। হ্যাঁ, মহারাজ। দুজন বিদেশীই এসেছিল। পরিচয়পত্র না থাকায়--

কোথায়, কোথায় তাঁরা? কোন দিকে গেছেন? রাজামশাই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। খোঁজ খোঁজ। লোকজন ছুটল। এদিক, ওদিক, সেদিক। বেশি দূর যেতে হল না। সকলেরই নজর পড়ল পাঁচিলের পাশে। পরিখার ধারে। রাজামশাই নিজে এগিয়ে গেলেন।

রাজপুত্ররা লক্ষ্য করছিলেন। রাজধানীর দরজায় কিসের যেন সোরগোল। তা যে তাঁদের নিয়ে কে ভাবতে পেরেছিল? এক লহমায় কি থেকে কি হয়ে গেল। মহা আদর, মহা আপ্যায়ন। রাজবাড়ির সেরা ঘরে, সেরা বিছানায়, সেরা খাবারে, পোশাকে-আশাকে, সেরা দাস-দাসীর মধ্যে তাঁরা জমকালো হয়ে উঠলেন। একেবারে রাজপথ থেকে রাজপ্রাসাদে। অনেক দিনের পর অনেক আরামে।

কিন্তু এত খাতির কেন কিছুই বোঝা যায় না। জিজ্ঞাসা করলে রাজামশাই শুধু বলেন, আমাদের পরম পুণ্যে আপনাদের পেয়েছি। আপনাদের পায়ের ধূলোয় আমি কৃতার্থ। আমার রাজ্য ধন্য।

রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র মুখ চাওয়া চাওয়ি করেন। কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। এ রাজ্যটি কি অদ্‌ভূতের রাজ্য? কিম্বা পাগলের? দেশের লোকগুলো কেমন যেন। রাজাটিও তেমনি।

যাই হোক, যে জন্যে রাজধানীতে আসা, এসে এত উলটো-পালটা ব্যাপার, তা ত একবার খোঁজ করতে হয়। কেন এদেশের লোকের মনে ভয়-ভয়, কেন দুঃখ? কিসের সে পাপ?

সন্ধ্যে বেলায় রাজামশাই নিজেই কথাটা পাড়লেন।

রাজধানীর খানিক দূরেই এক পাহাড়। দিন রাত তার ভিতর থেকে এক আর্তনাদ ওঠে। আকাশ ফাটানো, গম্ভীর। পষ্ট মানুষের গলায়। মস্ত এক গুহায় মুখ রেখে যেন কোন বিরাট এক দৈত্য গোঙাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠছে থেকে থেকে:

যেমন কর্ম তেমনি ফল,
যেমন কর্ম তেমনি ফল,
যেমন কর্ম তেমনি ফল

…শুনলে গা ছমছম করে, শিউরে ওঠে। শুধু তা-ই নয়, পাহাড়টা দিনে দিনে বাড়ছে। উঁচুতে, চারপাশে। বাড়তে বাড়তে একটি পাহাড় হাজারটি হয়েছে। নানা শাখা-প্রশাখায় পর্বতমালা।

অনেক দিনের পর

গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে, শতমুখে আর্তনাদ করে পাহাড় চলেছে এগিয়ে। আশেপাশের জন-প্রাণী পালিয়ে গেছে। এমন কি ঘাস-পাতা, গাছ-গাছড়াও মরে মরে ধূলো হয়ে গেছে।

রাজধানী সরিয়ে সরিয়ে এতদূর আনা হয়েছে। চারপাশের গ্রামের লোকেদেরও রাজামশাই উঠে আসবার ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই আবার রাজধানী সরাতে হবে। আরও দূরে, রাজ্যের প্রান্তে।

পাহাড়টা এমনি করে বেড়েছে কতদিন ধরে, কত বছর ধরে কেউ জানে না। দেশের লোক, রাজ্যের রাজা ভয়ে ভয়ে কত পুজো দিয়েছেন, কিছু হয়নি। শোনা যায়, অনেক বছর আগে যখন এটা ছিল একখানা পাথরের চাঁই, তখন তাকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু যারা ভাঙতে গেল, কেউ ফেরেনি।

দেশের প্রজারা অনেকেই উঠে গেছে অন্য অন্য দেশে। এ দেশে থাকবে না তারা। এ অমঙ্গলের দেশে। যারা আছে রাজামশাই-এর অনেক অনুরোধে আছে। তাদেরও বুঝি আর রাখা যায় না। এ রাজ্য, এ সোনার দেশ বুঝি এক খাঁ খাঁ ভুতের রাজ্য হয়ে যায়। ভিন দেশ থেকে দলে দলে লোক আসে অদ্ভূত ওই পাহাড়গুলো দেখতে, পুজো দিয়ে যায়। দূর থেকে। অনেকে সাহস করে এগুতে গেছে। কিন্তু পাগল হয়ে ফিরেছে। বাকী জীবনটুকু আর্তনাদ করে কাটিয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল, যেমন কর্ম তেমনি ফল!

এই বিপদ থেকে বাঁচার কি উপায়? এ ত মানুষ নয়, দত্যি-দানব নয় যে যুদ্ধ করব, দেবতা নয় যে তপস্যা করব, ভূত নয় যে ওঝা ডাকব? এ যে জ্যান্ত পাহাড়!

এর জন্যে দায়ী নাকি এ রাজ্যের রাজা--রাজার কোন পূর্ব-পুরুষের পাপ। দেশের লোকের তাই ধারণা। তা-ই যদি সত্যি হয়, রাজামশাই কি করতে পারেন? কি করলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়?

তিনি প্রাণ দিতেও রাজি। যদি তাতে লাভ হয়। আর এ বিপদ থেকে এ রাজ্যে যে বাঁচাবেন, তাকেই তিনি রাজ্য দেবেন। আদ্ধেক নয়, পুরো রাজ্য। দেবেন সমস্ত ধনদৌলত। আর তাঁর পরমা সুন্দরী কুঁচবরণ কন্যে।

এতদিন পরে তিনি আশার আলো পেয়েছেন। স্বপ্নের কথা কি মিথ্যে হবে?

আপনাদের রাজ্য আপনারাই নিন। দেশের বিপদ দূর করুন। দেশের ভার নিন। আমি শুধু দেখে যাব আমার বাপ-ঠাকুর্দার রাজ্য রক্ষা পেল। অমঙ্গলের হাত থেকে, রহস্যময় পাপের থেকে। এই বলে রাজামশাই তাঁর কথা শেষ করলেন। রাজপুত্র এক মনে এ কাহিনী শুনছিলেন। অবাক হয়ে। এবার মন্ত্রীপুত্রের দিকে তাকালেন। মন্ত্রীপুত্রের মুখ থম থম। কিসের চিন্তায় ভার ভার। দেশের এ পাহাড়ি বিপদ কি করে দূর করবেন জানেন না রাজপুত্র। অথচ রাজামশাই ত বিশ্বাস করে বসে আছেন তাঁরাই সব করতে পারবেন। এদিকে রাত অনেক। লোকজনের কোলাহল আর শোনা যায় না। দূর থেকে ভেসে আসে এক গুরু গুরু গম গম আওয়াজ। একটানা একতালে মেঘের ডাকের মতন। রাজপুত্র কান পেতে শুনতে থাকেন।
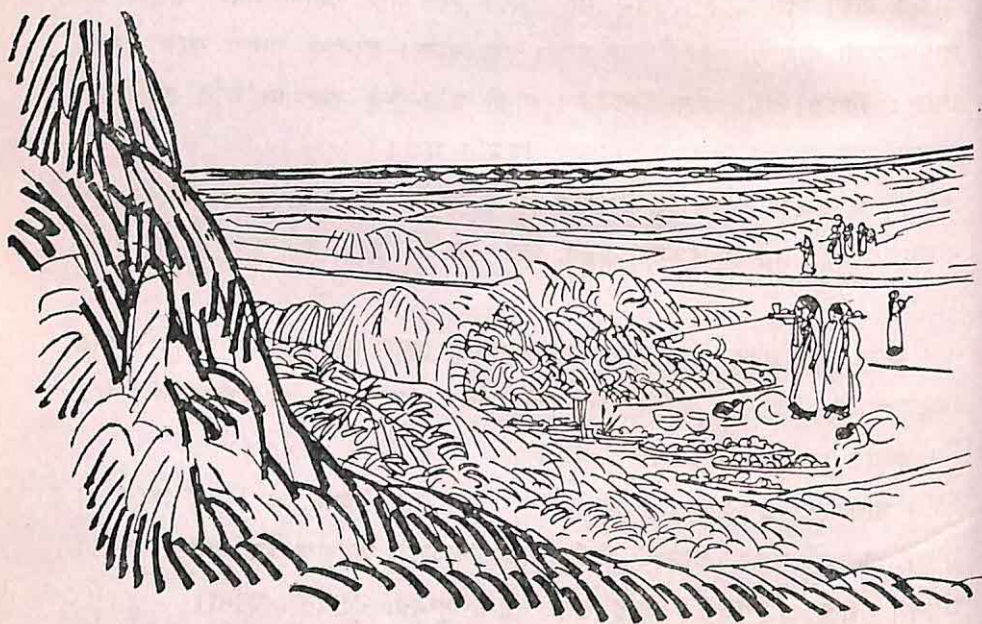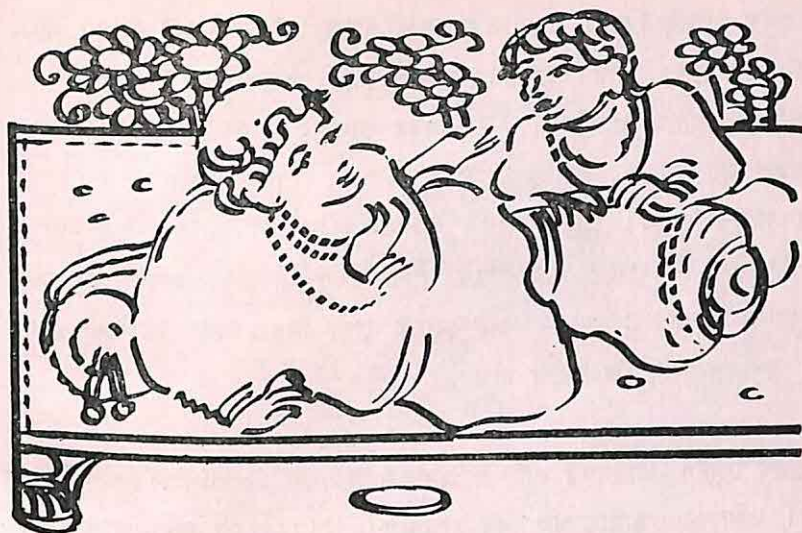
শলাপরামর্শ, যুক্তি যাত্রা

॥ পাঁচ ॥

সকাল। রোদ-চিক-চিক সকাল।

রাজপুত্রের ঘুম ভাঙে। বন্দিদের গানে। নহবতের সুরে।

ঘরে মন্ত্রীপুত্র নেই। কোথায় গেলেন?

এক পরিচারিকা। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মন্ত্রীপুত্র রাজার কাছে।

এত সকালে? তাকে না ডেকেই?

একটু পরে এলেন মন্ত্রীপুত্র।

উঠেছিস? মন্ত্রীপুত্র শুধোলেন। আমি একটু গিয়েছিলাম রাজামশায়ের কাছে।

জানি। বলে রাজপুত্র চুপ করলেন।

দ্যাখ, আমি অনেক ভেবেছি। কাল থেকে। এদের এই ব্যাপারটা নিয়ে। মনে হচ্ছে কিছু করতেও পারি। হয়ত। রাজার কাছে সেই নিয়েই গিছলাম।
কি করবি। আমাকে বলবি না? রাজপুত্রের রাগরাগ ভাব।
কেন বলব না, বাঃ। তোকে বলতেই ত এলাম। পরামর্শ করতে।
রাজপুত্র উৎসুক হলেন। এগিয়ে বসলেন। কাল থেকে তিনিও কম ভাবেননি। কিন্তু কি হবে, কি করতে হবে--ভেবে পাননি কিছুই। এখন মন্ত্রীপুত্রের কথা শুনে, আসল কথা না শুনেও, তাঁর কেমন যেন বিশ্বাস হয় কিনারা একটা হবেই। স্বপ্নের কথা কি মিথ্যে হবে?

আমি তখন ছোট। আমাদের বাড়িতে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। মন্ত্রীপুত্র বললেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। তিনি একটা গল্প বলেছিলেন। সেই গল্পের সঙ্গে এখানকার ঘটনা মিলে যাচ্ছে। কিন্তু সদাগরপুত্র, কোটালপুত্র এদের দেখা না পেলে যে কিছুই হবে না। কি করা যায়, বলত?
আমি তোর গল্পও জানি না, কিসে তোর মুস্কিল তাও জানি না। আমি কি করে বলব?
রাজপুত্র একটু যেন রেগেই গেছেন।
মন্ত্রীপুত্র হাসলেন। এবার অনেকক্ষণ রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্রের কথা চলল। শলাপরামর্শ। যুক্তি-যাক্তা।

॥ ছয় ॥

সারা রাজ্যে ডংকা

সারা রাজ্যে ডংকা। লক্ষ মোহর পুরস্কার। রাজ্যের পাশে যে নিথর-নিঝুম বন, সেখানে দুজন বিদেশী হারিয়ে গেছেন। গান্ধার দেশের সদাগরপুত্র-কোটালপুত্র। কোনদিকে কোনদেশে তাঁরা গেছেন, কেউ তা জানে না। তাঁদের খুঁজে আনতে হবে। লক্ষ মোহর পুরস্কার। সারা রাজ্যে ডংকা।

আর ওই জ্যান্ত পাহাড়ের ধারে যে বউ-ভাসির দীঘি আছে? যে দীঘিতে মানুষ যায় না, জন যায় না। পাখি-পাখাল, শিয়াল-কুকুরও মাড়ায় না। সেই দীঘির আশ-পাশ, এপার-ওপার খুঁজে হাড় আনতে হবে। টুকরো হোক, ভাঙা হোক--ক্ষতি নেই। লক্ষ মোহর পুরস্কার। সারা রাজ্যে ডংকা।

সদাগরদের খোঁজে লোক ছুটল। এদিক, ওদিক, সেদিক। কিন্তু বউ-ভাসির দীঘিতে কেউ যায় না। লোকে এইটুকু বয়স থেকে শুনে আসছে ওখানে যেতে নেই। সেখানে মানুষ যায় না, জন যায় না, পাখি-পাখাল, শিয়াল-কুকুরও মাড়ায় না। সেখানে কে যাবে? আর হাড়ই বা সেখানে আসবে কোথা থেকে?

এক দিন দু-দিন, দশ দিন, কুড়ি দিন, এক মাস যায় যায়। কেউ আর ডংকা ধরে না। কেউ যেতে চায় না বউ-ভাসির দীঘি। কেউ না। রাজার সৈন্য, রাজার লোকজনও না।

এবার নতুন ডংকা। এক লাখ নয়, দু-লাখ নয়, পাঁচ লাখ মোহর। সারা রাজ্যে নতুন ডংকা।

শেষে এক বুড়ি, ঘুঁটে কুড়ুনি বুড়ি, সে রাজি হল। তার অনেক দিনের সাধ, সোনার খাটে শোবে, মস্ত বাড়িতে থাকবে। হাজার ঝি-চাকর তার কথায় উঠবে, তার কথায় বসবে।

তিন কুলে তার কেউ নেই। দীঘিতে গিয়ে যদি সে মরে ত মরবে। কিন্তু বাঁচলে? হাড় আনতে পারলে? তাহলে ত সাধটা মিটবে। ঘুঁটে ত আর কুড়োতে হবে না। শেষের কটা দিন ত কাটবে আরামে, মজায়।

বুড়ি রাজি হল। ডংকা ধরল। হাতে একটা লাঠি নিয়ে চলল খুট খুট।

বউভাসীর দিঘী

॥ সাত ॥
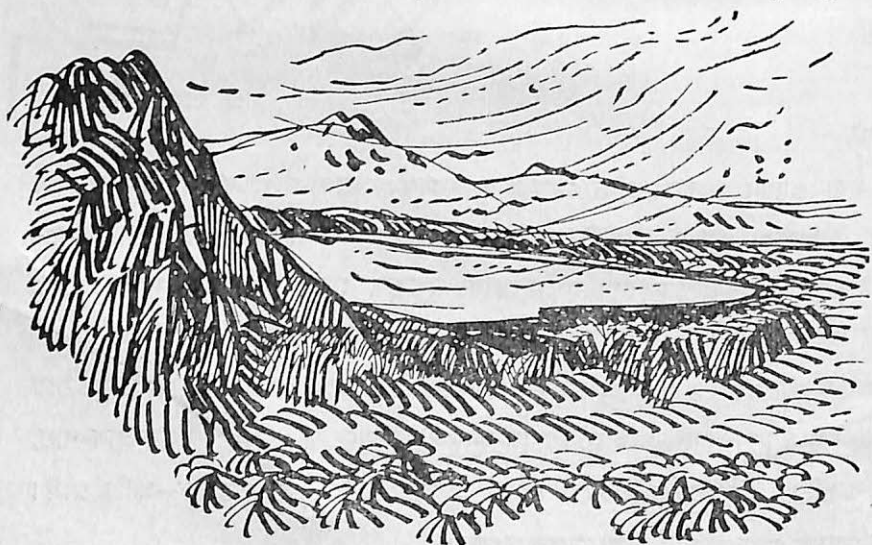
সদাগরপুত্র-কোটালপুত্র তখন অতিথি। এক মালিনীর ঘরে। মালিনী তাদের মাসী। পাতানো মাসী। তার ছেলে-পুলে নেই। নেই তিন কুলে কেউ। লোক-জন রেখে ফুলের চাষ করে। কতো ফুল। শিশিরে ভেজা, নানান রঙের, গন্ধের। টবের ফুল, লতার ফুল, জলের ফুল, ডাঙার ফুল, দিনের ফুল, রাতের ফুল। গরমের,বর্ষার, শীতের সব সময়ের। ফুলের তোড়া, ফুলের মালা, কুঁড়ি, পল্লব এই সব বিক্রি। বাড়ি বাড়ি। কার বাড়িতে পুজো, কার বাড়িতে ফুলসজ্জা খোঁজ রাখতে হয়। আবার রোজ জোগান আছে।

এত কাজ, একা মানুষের বড় কষ্ট। সদাগরপুত্র-কোটালপুত্রকে পেয়ে মাসী খুব খুশি। ওঁরাও মাসীর সঙ্গে ভাব করে নিয়েছেন। মাসী বলে, তোমরা বাপু বড় ভাল ছেলে। তোমরা এখানেই থেকে যাও। খাও দাও। আমার বাড়ি-ঘর, আমার বাগান, আমার ব্যবসা, আমি মরলে কে দেখবে। আমার টাকা-পয়সা কে নেবে। তোমরাই থাক। রাঙা টুকটুকে বউ আনো। আমি নাতি-পুতি নিয়ে ঘর করি। বুড়ো বয়সে একটু আরাম করি।

সদাগরপুত্র হাসেন। কোটালপুত্র হাসেন। বলেন, ভালই ত। আমাদের ঘর ছিল না, ঘর পেলাম। মাসী ছিল না, মাসী পেলাম। থাকব বই কি!

একদিন মাসী আছে ঘরে। রান্না-বান্না করছে। সদাগরপুত্ররা গেছেন বাজারে। ফুল বেচতে। একটা কালো মত লোক এল। আলাপ জমালো। যেচে। নাম শুধলো। ধাম শুধলো। শেষে বলল, গান্ধার দেশের রাজপুত্রকে চেনেন? মন্ত্রীপুত্রকে চেনেন?

ওঁরা ত লাফিয়ে উঠলেন। কোথায়, কোথায় তারা? বেঁচে আছে? ভালো আছে? লোকটা জানাল, হ্যাঁ, তাঁরা সবাই ভাল আছেন। তবে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হলে গোপনে যেতে হবে। সে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। দয়া করে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। মানা আছে।
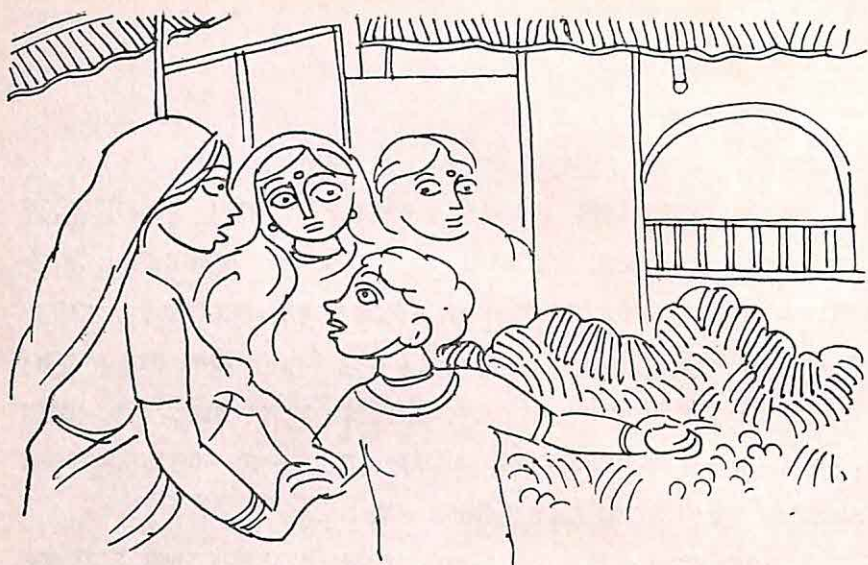
'না' বললে শুনব না কিন্তু

মাসীর রান্না তখনও শেষ হয়নি। সদাগরপুত্র-কোটালপুত্র কাছে গিয়ে বসলেন। মুখ কালো করে।

কি বাছারা, মুখ অন্ধকার কেন? মাসী ব্যস্ত হয়ে উঠল। কোটালপুত্র বললেন, তোমার কষ্ট দেখে।

এত বয়স হল, একটু তীর্থ-ধম্মো করলে না। কেবল ফুল আর বাগান, বাগান আর ফুল। এই করেই জীবন গেল।

মাসীর এক গাল হাসি। তা বাবারা, কেই বা আমাকে নিয়ে যায়, কেই বা আমার দুঃখ বোঝে।

না মাসী। আমরা তোমাকে কাশী নিয়ে যাব। কামরূপ নিয়ে যাব। দেখাব সোমনাথ, কাঞ্চিপুরম। কালকেই যেতে হবে। না বললে শুনব না কিন্তু, হ্যাঁ। মাসী এক পায়ে খাড়া। ঘর রইল, দোর রইল। বাগান-বাগিচা সব পড়ে রইল। মাসী পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াল, বোনপোদের সঙ্গে তীর্থে যাচ্ছি গো! চারখানা পাল্কী এল। চারজনের। সদাগরপুত্র, কোটালপুত্র, মাসী আর কালো-মত লোকটার। চল্লিশজন বেয়ারা এল। চলল তারা হুম হুম।

পাড়ার লোক অবাক। মাসীর এত বড়লোক বোনপোরা কোথায় ছিল এতদিন।

॥ আট ॥

খুট খুট। বুড়ি চলেছে লাঠি হাতে। ঘুঁটে কুড়োনি বুড়ি। পথ নেই। শুধু কাঁকর ভরা মাঠ। উঁচু-নিচু।

মাঠের ওপারে দূরে ধোঁয়া ধোঁয়া পাহাড়। সেখান থেকে আসে আওয়াজ। মেঘের ডাকের মত। ঝড়ের গোঙানির মত। যেমন কর্ম তেমনি ফল, যেমন কর্ম তেমনি ফল।

রাজামশাই-এর সৈন্যরা এক যোজন দূরে বুড়িকে নামিয়ে দিয়েছে। বুড়ি চলেছে মাঠ ভেঙে। লাঠি হাতে। খুট খুট।

মাঠের মাঝে পাড় ভাঙা দীঘি। বউ-ভাসির দীঘি। কত কালের কে জানে। বুড়ি আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ায়। এক পাড়ে। কোমর সোজা করে। লাঠিতে ভর দিয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতে। অনেক নিচে কালো জল টলটল। দুপুরের রোদে ঝিকমিক। চার পাশে লাল লাল কাঁকর। পায়ের নিচে, লাঠির গোড়ায় খড় খড়। আর কানের কাছে সেই গোঙানি —যেমন কর্ম তেমনি ফল, যেমন কর্ম তেমনি ফল।

খুট খুট, বুড়ি চলেছে

চারদিকে খাঁ খাঁ, ধু ধু। এতক্ষণে বুড়ির ভয় ভয় করে। মনে হয়, এই ভীষণ মাঠ থেকে আর ফিরতে পারবে না। এইখানে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে। মরে পড়ে থাকতে হবে। খাঁ খাঁ আকাশের নিচে। এই ধারালো কাঁকরের বুকে। কেউ দেখবে না, শ্মশানেও নিয়ে যাবে না।

বুড়ির চোখ জ্বালা করে। দূরের পাহাড়টা যেন এগিয়ে আসছে। সেই আও-য়াজটা যেন আরও জোর। অনেকদিন পরে মরা ছেলের নাম করে সে কেঁদে উঠতে চায়।

কিন্তু গলা দিয়ে রা বেরয় না। হাত পা যেন অবশ। বসে পড়ে সে থপ্ করে।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু--লোকে বলে। লোভে পড়ে কেন সে এল? বেশ ছিল ছোট্ট কুঁড়েতে। সেই মাঠে মাঠে গোবর কুড়নো। বাড়ি বাড়ি ঘুঁটে বেচা। বেচতে গিয়ে দু-দণ্ড গল্প করা। এ পাড়ার খবর ও পাড়ায় দেওয়া। ও বাড়ির খবর এ বাড়িতে। বেশ ছিল। নরম নরম গোবর আর তার সোঁদা সোঁদা

কেউ দেখবেনা, শ্মশানেও নিয়ে যাবেনা

গন্ধ মনে পড়ে। মনে পড়ে একটুখানি মাটি দিয়ে, খানিকটা খড়কুটো দিয়ে গোবর মেখে ঘুঁটে দেওয়া। গাছের কিম্বা দেওয়ালের গায়ে লেপটে দেওয়া। চার আঙুলের চাপ দিয়ে। মনে পড়ে। ভাল লাগে।

কিন্তু কি এমন ভাল? সারাদিন খেটে-খুটেও পেট ভরে না। ঘরের চালে খড় নেই। জল পড়ে। গোবর কুড়োতে গিয়ে হাঁটুতে খিল ধরে, হাঁপ ধরে বুকে। অসুখ-বিসুখে দেখবার নেই কেউ।

এই বয়সে বড় বড় বাড়ির বুড়িরা আরাম করে, কত আরাম।

নাঃ, যদি মরতে হয়, ভাল করে দেখে মরবে। শেষ চেষ্টা করে। বুড়ি তাকায় সামনে। অনেক নিচে টল টল কালো জল। পাড়ে পাড়ে কাঁকর লাল লাল।

খুট খুট। বুড়ি চলেছে। লাঠি হাতে। ঘুঁটে কুড়োনি বুড়ি।

নিচে নামবে।

এত টাকা নিয়ে কি করবে

॥ নয় ॥
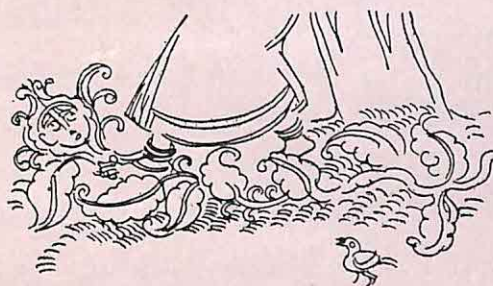
রাজামশাই খুব খুশি।

কোটালপুত্র সদাগরপুত্র ফিরেছেন।

কালোমত লোকটা লক্ষ মোহর পেল। আর দরবারে ভাল চাকরি। বুড়ি দু-খানা হাড় পেয়েছে। বেঁধে এনেছে কাপড়ের খুঁটে। হাজার লোক এসেছিল বুড়ির পিছন পিছন।

রাজামশাই বলেছিলেন, এত টাকা নিয়ে কি করবে তুমি?
সব শুনে হেসেছিলেন। তারপর তাকে বাড়ি দিলেন, ঘর দিলেন। হাজার দাসদাসী সব।
এইবার দেখা যাক কি হয়। রাজপুত্ররা কি করেন। নিশ্চয়ই পারবেন। তাঁর বিশ্বাস বেড়েছে। স্বপ্নের কথা কি মিথ্যে হবে?

পরদিন। রাজসভায় কাতারে কাতারে লোক। সবাই উৎসুক। কী হয়, কী হয়। ঘন্টা বাজল ঢং ঢং। রাজামশাই এলেন। সঙ্গে চারজন। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, সদাগরপুত্র। চারটি যেন চাঁদ। আলোয় আলো রাজসভা। তাদের আসনের সামনে একটি থালা। সোনার। তার উপরে দুটি হাড়। বুড়ির আনা সেই হাড় দুটি।
কাতারে কাতারে লোক। সবারই মনে কি হয়, কি হয়।
রাজামশাই উঠলেন। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন চার বন্ধুর।
রাজপুত্র উঠলেন এবার। একটি হাড় তুলে নিলেন হাতে। বললেন, এই হাড় যার, তাকে আমরা বাঁচাব। আপনারা কিন্তু চুপ করে থাকবেন।
কাতারে কাতারে লোক থ হয়ে রইল। বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল রাজপুত্রের দিকে। তারপর গমগম করে উঠল রাজসভা। সুর করে চেঁচিয়ে উঠেছেন রাজপুত্র। মন্ত্র। তারপর মন্ত্রীপুত্র, সদাগরপুত্র, কোটালপুত্র। একে একে। রাজামশাই অবাক। সভাসুদ্ধ লোকও। এক পরমকান্তি কুমার। এলোমেলো চুল, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক। তবু চেহারা দেখে চোখ জুড়োয়।

আমার নাম বিশালশাখা

সভার লোকজন চঞ্চল। আনন্দ, ভয়, বিস্ময়। কে ও?

মন্ত্রীপুত্র এগিয়ে এলেন। কি নাম তোমার ভাই?

আমার নাম বিশালশাখা। কিন্তু এ আমি কোথায়?

বলছি। কিন্তু তুমি ভাই অসুস্থ। একটু বিশ্রাম কর। সব বলব।

মহারাজ এর বিশ্রামের ব্যবস্থা করুন।

রাজপুত্র আবার উঠলেন। আর এক টুকরো

হাড় হাতে। লোকেরা চুপচাপ।

আবার গমগম করে উঠল রাজসভা।

সুর করে চেঁচিয়ে উঠেছেন রাজপুত্র। মন্ত্র।

তারপর মন্ত্রীপুত্র। সদাগরপুত্র, কোটালপুত্র।

একে একে।

রাজামশাই অবাক। সভাসুদ্ধ লোকও।

এক পরমা সুন্দরী কন্যে। পরনে লাল পলাশ

শাড়ি। কপালে লাল টকটক সিঁদুর।

যেন ঘুম ভেঙে উঠেছে।

কন্যা চমকে উঠল। এত লোক দেখে।

তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দিল মাথায়।

তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে

|| দশ ||

পরদিন।

আবার রাজসভা। আবার লোকজনে গমগম।

বিশালশাখা দাঁড়ালেন।

আজ থেকে সাতশ বছর আগে আমি বেঁচে ছিলাম। এখানে, এদেশেই। আমি ছিলাম যুবরাজ।

আজ যে বিপদের কথা সবাই ভাবছেন, সেই পাহাড়ে, সেই জীবন্ত পাহাড়ে বন্দী আমারই বাবা। রাজা বিষাণদেব। বন্দী হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছেন। এক ঘোর পাপের।

আপনারা তাঁরই রাজ্যে বাস করছেন। আজকের রাজা তাঁরই বংশধর। আপনারা সবাই সে পাপের কথা না শুনলে তাঁর মুক্তি নেই। সে পাপের পুরো প্রায়শ্চিত্ত নেই। বিশালশাখা একটু চুপ করলেন। রাজামশাইরা ভাবলেন, এতকাল তাহলে ঠিকই শুনেছেন। রাজার পাপে রাজ্যের সর্বনাশ। রাজার পাপে প্রজার দুঃখ। কি সেই কাহিনী? কোন সে পাপ বিষাণদেবের?

আগ্রহে সকলের নিঃশ্বাস বুঝি বন্ধ। এত লোকজন, তবু থমথম। পাহাড়ের সেই আর্তনাদ আরও ভীষণ হয়ে উঠেছে। পষ্ট শোনা যায়। যেমন কর্ম তেমনি ফল, যেমন কর্ম তেমনি ফল। মেঘের ডাকের মত, ঝড়ের গোঙানির মত।

বিশালশাখা কান পেতে শুনলেন। চোখ দুটো তাঁর জলে ভরে এল। উঃ, কত কাল, কত কাল বাবা তাঁর বন্দী। এই বিভীষিকার পাহাড়ে। নিজে প্রায়শ্চিত্ত করছেন। দেশের লোক, তাঁর বংশধররাও জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। সেই বিভীষিকার নিঃশ্বাসে। অথচ মনে হচ্ছে এই সেদিনের কথা। ইরাবতীর করুণ মুখ। বাবার সেই রেগে যাওয়া ভীষণ চেহারা।

বিশালশাখা এবার তাঁর কাহিনী শুরু করলেন।

ছোট্ট একটা কুঁড়ে। নদীর ধারে। সেখানে থাকত এক মেয়ে। কাঠুরের মেয়ে। ইরাবতী। চড়ুই পাখির মত চঞ্চল। নদীর ঢেউ-এর মত তার হাসি। ডানপিটে খুব। ঘুরে ঘুরে বেড়াত। বনে-জঙ্গলে। গান গাইত। খেলা করত। খেলার সাথি তার গরু, বেড়াল, হরিণ, শালিক, ময়না, টিয়ে এইসব। পাখিদের কখখনো খাঁচায় ভরত না। পাখির বাচ্চাদের খাবার দিয়ে আসত গাছে উঠে। বেড়ালের হাত থেকে বাঁচাত। বনের মধ্যে কোথায় ফুটছে বনফুল, ইরাবতী তার খোঁজ রেখেছে। আশে-পাশের শুকনো পাতা সরিয়ে দিয়েছে। তুলে দিয়েছে আগাছা। হরিণরা আসত ছুটে। সে হাততালি দিয়ে ডাকলে। পাখিরা আসত উড়ে। গান গাইত। শিস দিত।

বনের দেবী তার ওপর খুব খুশি। একদিন দেখা দিলেন। মাথায় তাঁর পাতার মুকুট। গায় ফুলের সাজ। কত রং। কত বেরং। বলেন, কি বর চাও?

ইরাবতী প্রথমে অবাক। প্রণাম করল। তারপর একটু ভেবে বলল--আমি যেন পশু-পাখির গাছ-পালার কথা বুঝতে পারি। ওদের কথা না বুঝলে ওদের সঙ্গে

কি বর চাও

ভাব হওয়া মুস্কিল।
বনদেবী খুশি হলেন। তথাস্তু। কিন্তু দেখো, কাউকে একথা বলো না যেন। সাবধান।
তারপর মিলিয়ে গেলেন বনের সবুজে।
নিমেষে একটা নতুন দেশে এল যেন ইরাবতী। সামনের গাছটা গান গাইছে। আকাশে পাতা মেলে দিয়ে।
মনের সুখে।

সূর্য উঠুক।
আরো উঠুক।
তাতুক আকাশ।
গরম রোদে
ভরব যে বুক।

পাখি আসুক,
বসুক ডালে।
নরম সুরে
গেয়ে উঠুক।
আহা, কি সুখ।

দুটো হরিণ আসছে ছুটতে ছুটতে। বলছে, শীগগীর আয়। জল খাব নদীতে। তারপর খেলতে হবে কিন্তু।
উঃ! দেখতে পাও না? দয়া-মায়া নেই? কি রকম মাড়িয়ে দিলে? ইরাবতী চমকে উঠল। একটা লতা তার দিকে তাকিয়ে। খুব রেগে গেছে। ইস্। সত্যি দেখতে পাইনি ভাই। লতার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল ইরাবতী। চুমু খেল।
ঘরে মন বসে না। লোক-জনদের, বাবাকে মনে হয় নিষ্ঠুর। গাছের গায়ে কুড়ুল মারলে গাছ কত কাঁদে, আর্তনাদ করে। ওরা মনে করে কুড়ুলের শব্দ। ভেঙে পড়বার সময় গাছের কী চিৎকার। অথচ মানুষেরা কিছুই বোঝে না। ঘরে মন
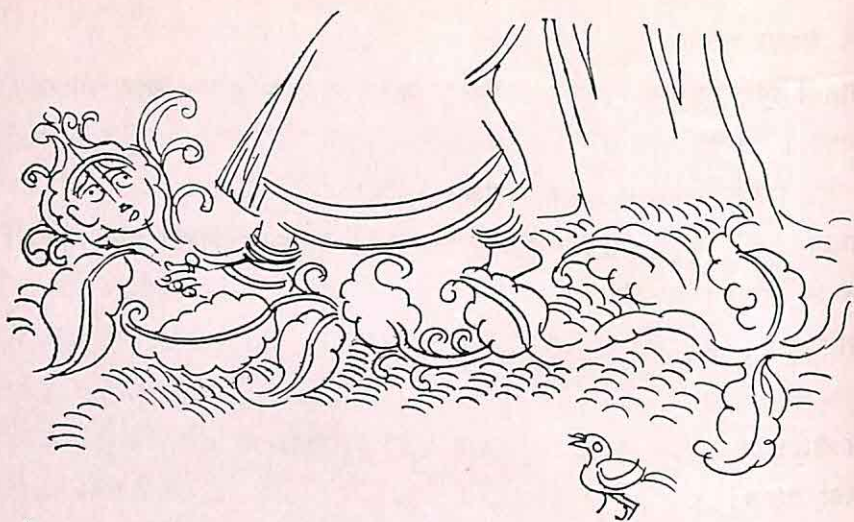
উঃ, দেখতে পাওনা

বসে না ইরাবতীর। নদীর ধারে বনে বনে ঘোরে। আপন মনে। গাছ-পালার সঙ্গে ভাব জমায়। ওদের কষ্ট দূর করে। যেটুকু পারে।
কাঠুরে-গিন্নী চিন্তিত। কাঠুরেকে ডেকে বলে, ও মেয়ে তোমার কেমন ধারা হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে একা একা কার সঙ্গে কথা বলে। এমনি এমনি। হাসে। জিজ্ঞেস করলে লজ্জা পায়। বলে, কিছু না।
তুমিই ত আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথা খেয়েছ। পাড়ার এক বয়সী কারও সঙ্গে খেলা নেই। যত খেলা ওই বনবাদাড়ে? কাঠুরে বলে রেগে।

কিছুদিনের মধ্যেই ইরাবতীর পাগলী নাম পাকাপাকি হয়ে গেল। বন-পাগলী।

॥ এগার ॥

একদিন হয়েছে কি। আমি গেছি শিকারে। বাঘ-ভালুক নয়, হরিণ শিকারে। তিড়িক তিড়িক হরিণ ছোটে। থমকে, ফালুক-ফুলুক তাকিয়ে ফের ছোটে তিড়িক তিড়িক। গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড় এড়িয়ে পেরিয়ে। কখনও বা একটু লুকিয়ে। ঘোড়ার পিঠে তীর নিয়ে তাক করে বেশ লাগে হরিণ শিকার।

সেদিনও ছুটেছি এক হরিণের পিছনে। বাচ্চা হরিণের । ছুটছি, ছুটছি। সংগের লোকেরা সব পিছিয়ে গেছে। হঠাৎ দেখি এক মেয়ে, তার ঘাম চকচক মুখ, জল চিকচিক চোখ। হরিণের বাচ্চাটা তার কোলে উঠেছে ছুটে। হরিণের ডাগর চোখে ভয়, মেয়ের হরিণ-চোখে মায়া।

আমি ঘোড়া থামিয়ে নেমেছি। তীর-ধনুক সামলে।

কেন এদের মারেন আপনারা? শুধু শুধু? ভালবাসতে পারেন না? হরিণটাকে আদর করতে করতে মেয়ে বলে ওঠে।

হরিণ কি তোমার পোষা? তাহলে থাক, মারব না।

হ্যাঁ, পশু-পাখি সব গাছ-পালাই আমার পোষা। আমি ওদের ভালবাসি। চুলের রাশি ছড়িয়ে, হরিণ-কোলে মেয়ে ফিরে গেল গাছের আড়ালে। ফিরে ফিরে দেখল শুধু। আমি রইলাম চেয়ে চেয়ে। সেই বনের মেয়ের দিকে। হাতে রইল ধনুক। ধনুকে রইল তীর। থেকেই গেল। মেয়ে হারিয়ে গেল বনে। আর পিছিয়ে পড়া লোকজন সব চলে এল। তবু শিকার আর হল না।

রাজধানীতে ফিরে এসে সময় আর কাটে না। শুতে-বসতে, ঘুরতে ফিরতে এক চিন্তা, এক ভাবনা। ওই মেয়ে। ওই বনের মেয়ে। ওই ডাগর চোখ। ভালবাসায়, মমতায় ভরা মুখখানি।

দাদাকে বললাম, বাবাকে বললাম। ওই বনের মেয়ে এনে দাও। ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না।

সে কি কথা। রাজার ছেলের রাজকন্যে বউ, তাই ত হয়। এসব কি সৃষ্টি-ছাড়া কথা? কোন ডাইনি মেয়ে তোকে এ মন্তর দিল? বাবা রেগে উঠলেন। গোসা ঘরে খিল দিলাম। ওই বনের মেয়ের কথা ভুলতে পারি না। রাজকন্যে যদি বা পাই, অমন ভালবাসার চোখ পাই কোথা, অমন মায়ায় ভরা মন? না পাই ত জীবন বৃথা। তো গোসা ঘরেই না খেয়ে মরি।

শেষে দাদা গিয়ে ধরল বাবাকে। যে মাটিতে শেকড় নামে বেশি, সেখানেই ত দাঁড়িয়ে যায় গাছ। শেকড় উপড়ে ফেলে অন্য মাটিতে পুঁতলে গাছটাই যে মরে যাবে শুকিয়ে। হোক না সে বনের মেয়ে। আসুক ইরাবতী, ভাইটি সুখে থাকুক।

এইসব বলে কয়ে বাবাকে রাজি করাল দাদা।

ইরাবতীর নতুন মহল। মালঞ্চ মহল। ফুলের গাছ। ফলের গাছ। লতার গাছ। বাহারি গাছ। আর বড় বড় গাছে খাঁচা। খাঁচার দাঁড়ে পাখি। ঝিলের ধারে হরিণের বাগান। ঝিলের জলে হাঁস আর বুনো পাখির দল। নতুন বউ

আমি রইলাম চেয়ে চেয়ে

ইরাবতী সব খাঁচা খুলে দিয়েছে। পাখিরা তবু চলে যায় না। গাছে-গাছেই থাকে। ইরাবতীর কাছাকাছি। হরিণরা ছুটে ছুটে খেলা করে ওর সঙ্গে। বউ পেয়ে রাজার মন ভরেনি। রাজ্যের লোকেরও না। এ কেমন ধারা বউ। মানুষের সঙ্গে তেমন মেশে না। গাছ-পালা হরিণ আর পাখি নিয়ে কিসের অত কাজ দিন-রাত। কুটুম কাটুম কাঠুরের আদর হয় না রাজসভায়।

একবার আমি গেছি রাজধানীর বাইরে। ফিরতে দেরী হয়েছে সাতমাস সাতদিন। রাজধানীতে ফিরতেই বিষাণদেবের তলব। এক্ষুনি দেখা করতে হবে। ধুল পায়ে। কি ব্যাপার? উষ্ণীষ রেখে অভিনন্দন করতেই বিষাণদেব বললেন, শোন বিশালশাখা, আমি প্রমাণ পেয়েছি তোমার নতুন বউ মানুষ নয়। রাক্ষুসী। ডাইনি। ওকে তুমি ত্যাগ করো। দুনিয়ার সেরা রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব, দুঃখ করোনা।
বাঃ, কিসে প্রমাণ পেলেন বলবেন না? বিয়ের আগেই ত আপনারা ধরে নিয়েছিলেন ও ডাইনি। আপনার ওসব প্রমাণ আমি বিশ্বাস করি না। আমি প্রতিবাদ করি।
জানি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। রাক্ষুসীর মায়ায় তুমি অন্ধ। ওকে তুমি না ছাড়লে তোমাদের দুজনকেই নির্বাসনে পাঠাতে হবে। রাজ্যের অকল্যাণ আমি হতে দেব না।
ঠিক আছে। যাব নির্বাসনে। তবে ইরাবতী রাজ্যের লক্ষ্মী। তাকে নির্বাসনে পাঠালে রাজ্যেরই সর্বনাশ হবে।
মালঞ্চে ফিরে এলাম। ইরাবতীর চোখে জল। তুমি আমাকে বাবার কাছেই রেখে এসো। বিয়ে করো এবার কোন রাজকন্যাকে।
না, তোমার উপর এ অন্যায় কেমন করে সইব। চলো এখুনি আমরা চলে যাই রাজ্য ছেড়ে। গভীর অরণ্যে।
সেই ভাল। বনের ধারে আমাদের বেশ ছোট কুঁড়ে থাকবে। গাছের ফল মূল আর চাষের ফসল খাব। ঝর্ণার জল আনব। নাইবা থাকল রাজ্যপাট, আট মহলের অট্টালিকা। আমরা সুখেই থাকব।

রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বন, গহীন বন। ভর দুপুরেও সেখানে ভোরের আলো। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি একদিন ইরাবতীর কোলে। হঠাৎ ঘুম ভাঙল বুকের কাছে নরম গরম ছোঁয়ায়। ইরাবতী আমার বুকে মুখ দিয়ে কি করছে? আমি উঠে বসেছি। ইরাবতীর মুখে রক্ত, চোখে ভয়। রাক্ষুসী, শেষ পর্যন্ত আমাকেই খাচ্ছিস? উঃ, কী মায়ায় ছিলাম এতদিন। বাবার কথা শুনিনি। রাজ্য পাট ছেড়েছি। সবই তোর জন্যে। এবার তোকে মেরেই ফেলব। শোধ তুলব সব ভুলের। বল তুই কে? আমি তার গলা টিপে ধরলাম।

হাসফাঁস করে ইরাবতী কথা বলল।

তোমাকে বাঁচাতে গিছলাম।

বটে? আমাকে বাঁচাতে বুকের রক্ত চুষতে হয় বুঝি?

না, আর আমি কিছু বলব না। বললে সর্বনাশ হবে।

হোক সর্বনাশ। বলতেই হবে।

ইরাবতী একটু চুপ করে রইল। দুচোখ বেয়ে তার জলের ধারা।

আচ্ছা, বলছি।

বনদেবীর বরের কথা বলল ইরাবতী। বলল, আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, এক ব্যাঙগমা এক ব্যাঙগমীকে কি বলছিল। বলছিল, রাজপুত্র এক্ষুনি মারা যাবে। একটা সরু সুতোর মত সাপ আস্তে আস্তে মস্ত হয়ে উঠবে। কামড়াবে রাজ-পুত্রকে।

আহা, অমন সুন্দর ছেলে। বাঁচানো যায় না ওকে?

যায়, কিন্তু সে বড় কঠিন কাজ।

কি কাজ?

সাপটা যখন ফণা তুলবে, এক কোপে দু টুকরো করতে হবে তাকে। তাতেও রেহাই নেই। যদি এক ফোঁটাও রক্ত পড়ে রাজপুত্রের গায়ে, তাহলেও ওকে বাঁচানো যাবে না। যাবে, যদি সঙ্গে সঙ্গে সেই রক্ত কেউ চেটে ফেলতে পারে। বড় কঠিন কাজ।

ইরাবতী চুপ করল। দুচোখ বেয়ে তার জলের ধারা। বনভূমি বোবা হয়ে

গেছে। পশুপাখির কথাও আর শোনা যায় না।

নিজের বুক দেখলাম। রক্ত নেই। কেউ রক্ত চুষে খায়নি।

ইরাবতী আরও বলল, আমি যখন ছিলাম না, একদিন রাত্তিরে এক শিয়ালের কান্নার কথা। শেয়ালটা সারাদিন কিছু খায়নি। মালঞ্চের পাশের নদীতে এক মানুষের মড়া ভেসে যাচ্ছিল। শেয়ালটা করুণভাবে বলেছিল, আহা যদি কেউ মড়াটা পাড়ে আনত ত খেয়ে বাঁচতাম। ওর কাপড়ের খুঁটেয় আছে সাত রাজার ধন এক মানিক। আমি আর মাণিক নিয়ে কি করব, যে মড়াটা আনবে, সে-ই না হয় নিত সে মাণিক।

ইরাবতী চুপিচুপি মালঞ্চ থেকে বেরিয়ে জলে নেমেছিল। মড়াটাকে পাড়েও তুলে এনেছিল। হয়ত বা কেউ তখন তাকে দেখে ফেলেছিল। ভেবেছিল রাক্ষুসী। রাজার কানেও উঠেছিল সে কথা। এদিকে মড়া তুলে এনে মানিকটা পেয়েছিল ইরাবতী। বাড়িতে পানের বাটায় রেখে এসেছে সেই মানিক। সাত রাজার ধন।

সব শুনে ইরাবতীকে বললাম, চল ফিরে যাই বাবার কাছে। সব কিছু বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। রাজ্যের লক্ষ্মীকে এমন করে বনে বনে ঘুরতে হবে না।
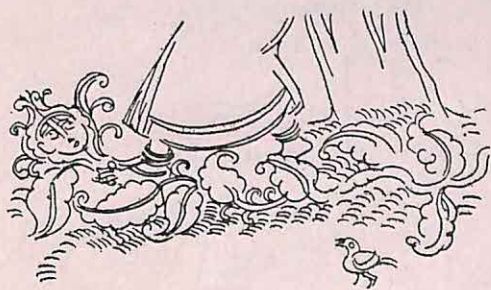
সাতদিন সাতরাত আমরা হেঁটেছি। তারপর। ফিরেছি রাজ্যের প্রান্তে। রাজ্যের লোকেরা কিন্তু আমাদের দেখে ভয়ে অস্থির। ওরা ত শুনেছে ইরাবতী রাক্ষসী, ডাইনি, কত কি।

রাজধানী যাবার অনেক আগেই রাজার কানে আমাদের ফিরবার কথা এসেছে। সাত ঘোড়ার রথে চেপে ছুটে এসেছেন। একাই রথ চালিয়ে। তাঁকে দেখতে পেয়ে বিশালশাখা সব কথা বলতে যাবেন, তার আগেই তলোয়ার তুলে এক কোপ বসিয়েছেন বিষাণদেব। ইরাবতীর ঘাড়ে। রক্ত উঠেছে ফিন্‌কি দিয়ে। ইরাবতী ঢলে পড়েছেন মাটিতে।

ওঃ আপনি এ কি করলেন? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? আমি কেঁদে উঠলাম।

শোকে দুঃখে পাথর

একটু সামলে, সব বললাম বাবাকে। বললাম সেই সাতরাজার ধন মানিকের কথা। মানিক তিনি আগেই পেয়েছেন মালঞ্চ মহল থেকে। পানের বাটা থেকে। সব শুনে বিষাণদেব থ'। লজ্জায়, শোকে, দুঃখে পাথর। আর সেই পাথর থেকে উঠল আর্তনাদ, যেমন কর্ম তেমনি ফল, যেমন কর্ম তেমনি ফল। মেঘের ডাকের মত, ঝড়ের গোঙানির মত।

ইরাবতীকে কোলে নিয়ে বিশালশাখা। সমস্ত রক্ত তখন লাল লাল পলাশ হয়ে গেছে। বাতাসে কান্নার সুর। ঘাসেঘাসে গাছের পাতায় হাহা রব। পাখিরা করুণ সুরে কেঁদে কেঁদে উড়ছে।

আর পাথরটা আমার সামনেই একটু একটু করে বড় হতে লাগল। আর্তনাদ করেই চলল, যেমন কর্ম তেমনি ফল, যেমন কর্ম তেমনি ফল। মেঘের ডাকের মত, ঝড়ের গোঙানির মত।

রাজ্যের লোক কেউ জানল না বিষাণদেবের কি হল। তারা শুধু দেখল রক্ত রাঙা ইরাবতীকে নিয়ে বিশালশাখা ভাসলেন এক দীঘির জলে। কলার ভেলায়। তারপর ঢলে পড়লেন ইরাবতীর পাশে। বিষের জ্বালায় নীল হয়ে। টলটল কালো জলের উপরে, চিক চিক নীল আকাশের নিচে। কাক, চিল, শকুন, পিঁপড়ে পর্যন্ত সে পথ মাড়াল না। হাওয়ায় শুধু কান্না ভেসে বেড়াল হা হা রবে। বউ ভাসির দীঘিতে। আর সেই পাথরটা বেড়ে যেতে যেতে আর্তনাদ করে চলল, যেমন কর্ম তেমনি ফল, যেমন কর্ম তেমনি ফল।

বিশালশাখা চুপ করলেন।

রাজসভা চুপচাপ। সবার চোখে জল।

আমারই দাদা তারপর সিংহাসনে বসেন। আজকের রাজা তাঁরই বংশধর।

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিশালশাখা।

সেই গুরু গুরু গমগম আওয়াজ, মেঘের ডাকের মত, ঝড়ের গোঙানির মত আওয়াজ কখন থেমে গেছে। টের পায়নি কেউ।

অমরাবতীর কন্যে

॥ এক ॥

কাশী থেকে কাঞ্চি। শ্রাবস্তী থেকে হস্তিনা।
কোন দেশ বাদ রইল?
অংগদেশের একমাত্র রাজপুত্র। তার বিয়ে।
এদেশ, ওদেশ, সব দেশে লোক ছুটছে। কনে দেখতে।
কাঞ্চি থেকে কাশী, হস্তিনা থেকে শ্রাবস্তী।
ভাট চলেছেন, পুঁথি লিখবেন, কন্যার রূপগুণ বর্ণনা করবেন।
শিল্পী চলেছেন, কন্যার পট আঁকবেন।
কন্যা দাঁড়াবেন অলিন্দে। নিচে চত্বরে এক চৌবাচ্চা। তাতে তাঁর ছায়া ভাসবে। ফুটফুটে জলে তুলতুলে ছায়া। সেই ছায়াকে পটে তুলে নেবেন শিল্পী। মুখোমুখি দেখা চলবে না। ঘাড় তুললেই গর্দান। হাজার হোক রাজকন্যে বলে কথা।
পট ত আঁকা হল শতেকখানা, পুঁথি ত লেখা হল এত এত, কিন্তু রাজপুত্র শালবাহুর কাউকে পছন্দ হল না।

অংগরাজ চিন্তিত হলেন। শালবাহু কি সন্ন্যাসী হবেন? বিবাগী হবেন সংসারে? নইলে এত সব রাজকন্যা, কুঁচবরণ আর কেশবতী, যাদের জন্যে কত রাজপুত্র জীবন দিতেও রাজি, তাদের কাউকে পছন্দ হল না? শালবাহুকে ডাকলেন। কিন্তু তাঁর এক কথা। কাউকে পছন্দ হয়নি।
তবে সামন্তকন্যাদের খোঁজ করি। তাদের কাউকে যদি ভাল লাগে।
আবার শিল্পী চলল তুলি নিয়ে। ভাট ছুটল কলম নিয়ে।
কাশী থেকে কাঞ্চি। হস্তিনা থেকে শ্রাবস্তী।
আবার পট আঁকা হল শতেকখানা। পুঁথি লেখা হল এত এত।
কিন্তু এবারও কাউকে পছন্দ হল না শালবাহুর।

অংগরাজ রেগে গেলেন। এবার সব ভিখিরি মেয়েদের ছবি আঁক। এ ছেলের কপালে ভিখিরি কিম্বা ঘুঁটেকুড়োনি মেয়েই আছে।

শিল্পীরা ভয়ে কাঁপে। যাবে কি না যাবে।

ভাটেরা থতমত। যাবে কি যাবে না।

মন্ত্রীরাও কাঁচুমাচু। শেষে প্রধান মন্ত্রী উঠলেন।

মহারাজ, আমি বলি কি, রাজপুত্র না হয় আর একবার ছবিগুলো, লেখাগুলো দেখুন ভাল করে। এবার হয়ত কাউকে ভাল লাগতেও পারে।

বলতে হয় আপনারা বলুন গে। আমি ওসব পারব না। রাজামশাই গটগট করে চলে গেলেন। খাস মহলে।

শালবাহুর মন খারাপ। নিজের মহলে বসে ভাবেন। তাই ত, বাবা রেগে গেছেন। কিন্তু আমি কি করব? কাউকে যদি ভাল না লাগে? তবু ফের দেখতে বসেন। মন্ত্রীমশায়ের কথামত। এ ছবি দেখেন, ও লেখা পড়েন। দেখে দেখে, পড়ে পড়ে প্রায় শেষ হয়ে গেল। শেষকালে একখানা ছবি দেখলেন। কন্যের নাম বিপাশা-কুমারী। নামটা মন্দ নয়। ছবিটা দেখেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। চোখ দুটো যেন বড় টানা। ঠোঁটে যেন রূপের গুমোর ফুটে আছে। পুঁথিতে কি লিখেছে দেখি।

লিখেছে, বিপাশার এতগুণ, সাতদিন সাতরাত বলে বলেও শেষ করা যায় না। এত রূপ কোন শিল্পী তাকে আঁকতে পারে না। তুলিতে ধরতে পারে না ঠিক ঠিক। অমরাবতীর রাজকন্যে বিপাশাকুমারী।

কিন্তু লিখবার সময় সবাই ত অমন বাড়িয়েই লেখে। রাজপুত্র উঠে দাঁড়ালেন। নিঃশ্বাস ফেলে। এবারও কাউকে পছন্দ হল না।

রাত তখন অনেক। আকাশে অনেক জোছনা। শালবাহু ছাতে এলেন। রাজপুরী ঘুমে নিঝুম। ঘুমে থমথম পায়রার ডানা। ছাতের কোণে কোণে সাদা পাথরের মূর্তি। দেবদূতের। রূপোলি জোছনায় তারা চান করছে। খেলা করছে আপনমনে। শালবাহুর সাড়া পেয়ে চমকে ওঠে তারা, থ হয়ে যায়। যে যেখানে ছিল।

শালবাহু ছাতের উপর হেঁটে বেড়ান। মনে তাঁর দুঃখ। চিন্তা। ভেবেছিলেন এমন কন্যে ঘরে আনবেন, রূপে তার জুড়ি মিলবে না, গুণে তার দুই থাকবে না। সেই যে হাসলে মানিক ঝরে, কাঁদলে ঝরে মুক্তো, হাঁটলে পরে ফুল ফোটে পায়ে পায়ে, তেমন মেয়ে ত মিলল না। তেমন কথা ত লিখল না কোন ভাট। নাঃ, বিয়ে আর করা হবে না। বাবা যদি খুব জিদ করেন, পালিয়ে যাবেন রাজ্য ছেড়ে। যেদিকে দুচোখ যায়।

থ হয়ে যায়

॥ দুই ॥

কে যেন কাঁদছে না? শালবাহ কান পাতেন। রাজপুরীর মধ্যেই ত। মেয়েলি গলার কান্না। শালবাহ তাকান এদিক ওদিক। ছাদের থেকে ঝুঁকে শোনেন। মন্দিরের চত্বরের দিকে কেউ কাঁদছে। আকাশের যত জোছনা যেন গলে গলে পড়ছে। কান্নায় আকুল হয়ে।

নেমে এলেন শালবাহ। এগিয়ে গেলেন।

চারদিক আলো করা, ঘোমটা পরা এক মেয়ে। আকুল হয়ে কাঁদছে। তার পায়ের কাছে বসে বললেন, কে মা তুমি? এখানে এমন করে কাঁদছ?

এদেশে অনেককাল ছিলাম। সুখেই ছিলাম। কিন্তু আর ত থাকতে পারি না।

কেন, কি দুঃখ তোমার?

কোন জবাব নেই। শুধু কান্নার আওয়াজ।

আমাকে বল। প্রাণ দিয়েও তোমার দুঃখ দূর করব। রাজপুত্র শালবাহ মিনতি করলেন।

করবে? মেয়েটি মুখ তুলে তাকাল। ঘোমটা খুলে। চোখ মুছে। রূপে তার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন শালবাহ।

আমি এ রাজ্যের রাজলক্ষ্মী। তুমি বিয়ে করবে না, তোমার বংশ থাকবে না, যার তার হাতে রাজ্য যাবে চলে, এ আমি সইতে পারব না। আর আমি গেলেই সারা রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হবে, মড়ক হবে, এ সোনার দেশ শ্মশান হবে। তাই কাঁদছি।

শালবাহ তার পায়ে লুটিয়ে পড়েন।

পারবে? পারবে আমার দুঃখ দূর করতে? এ দেশকে বাঁচাতে? রাজলক্ষ্মী আবার বলেন।

শালবাহ মুখ তোলেন। কিন্তু মা, আপনি ত আমার মনের কথা জানেন। তেমন কন্যে যে পাইনে।

রাজলক্ষ্মী হাসেন। আচ্ছা, এই আংটি দিচ্ছি। এটি পরলে তুমি অদৃশ্য হবে। কেউ দেখতে পাবে না তোমাকে। এই আংটি দিয়েই মনের মত কনে পাবে তুমি। নিজেই বেরুবে কনে খুঁজতে। বলতে বলতে রাজলক্ষ্মী জোছনা হয়ে গেলেন।

আকাশে ফুটল ভোরের আলো। হাওয়া বইল ঝির ঝির।

আমি এ রাজ্যের রাজলক্ষ্মী

পিছনে অদৃশ্য শালবাহু

॥ তিন ॥

অমরাবতীর রাজপ্রাসাদে এক অতিথি এসেছে। ভিনদেশি এক বণিক। বণিক নয়, ছদ্মবেশে শালবাহু।

রাজ অতিথি বলে কথা। যেমন খাতির, তেমনি যত্ন। ভোরবেলায় মিষ্টি সুরে গান গেয়ে ঘুম ভাঙায় বন্দিরা। তেমনি গানে ঘুম পাড়িয়ে যায় রাত্তিরে।

একজন রাজকন্যের সখী। রাজকন্যে বিপাশাকুমারীর। একথা সেকথায় জেনে নেন শালবাহু।

একদিন। রাজপুত্র শুয়ে পড়েছেন। সোনার পিলসুজে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে। হীরে মুক্তো মাণিক্যের গায়ে কাঁপে তার আভা। দরজায় কাঁপে চীনাংশুকের ঝালর। বোধহয় গানের সুরে সুরে। রাজপুত্র ঘুমের ভান করেন। বন্দিরা উঠে পড়ে। পা টিপে টিপে। একটু পরে রাজপুত্র শালবাহুও। সেই আংটি হাতে।
বিপাশাকুমারীর সখী চলেছে রাজকন্যের ঘরে। এ মহল সে মহল ঘুরে। পিছনে পিছনে শালবাহু। অদৃশ্য।

বিপাশাকুমারী একা বসে মালা গাঁথছেন। বিনি সুতোর মালা। সারা পিঠে ছড়িয়ে মেঘবরণ চুল।
এই কি সেই কন্যে? রাজলক্ষ্মীর বরে এতদিনে কি তার দেখা মিলল? কে জানে। সখীর সাড়া পেয়ে বিপাশাকুমারী শুধান, এতক্ষনে এলি? নে ফুলগুলো তুলে নে থালায়। চল।
থালায় ভরা ফুল নিয়ে, চন্দনের বাটি নিয়ে, বিনিসুতোর মালা নিয়ে কোথায় চলেছেন এঁরা? এত রাত্তিরে?
দুই সখী চলেছেন। দেউড়িটা পেরিয়ে এলেন। ইতিউতি চেয়ে। পিছনে অদৃশ্য শালবাহু। দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত।
রাস্তায় ওরা ফুল ছড়িয়ে চলেছে কেন? শালবাহু কাছাকাছি এলেন। আশ্চর্য, থালার ফুল একটাও কমেনি।

দুই সখী চলেছেন। শালবাহু চলেছেন। যেতে যেতে যেতে--সামনেই এক মস্ত নদী। রাস্তার শেষ। নদীর জল ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। পাড় ভাঙছে, ধসে পড়ছে ঝুপ ঝুপ। কী তার ঢেউ, কী তার গর্জন।
একি? দুই সখী যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন শালবাহু। কোথাও কারো চিহ্ন নেই। শুধু বড় বড় ঢেউ। আরও যেন মেতে উঠেছে নদী।

দুইজনকে গ্রাস করে। দুই হাত তুলে তাকেও যেন ডাকছে। ঝাঁপিয়ে পড়বেন নাকি? পড়বেন? পড়বেন নাকি?

নাঃ, কী হবে। এই ঢেউয়ে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ওদের, তার হদিশ নেই। কী হবে শুধু শুধু ঝাঁপিয়ে? খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শূন্যমনে ফিরে এলেন শালবাহু।

কী তার ঢেউ, কী তার গর্জন

॥ চার॥
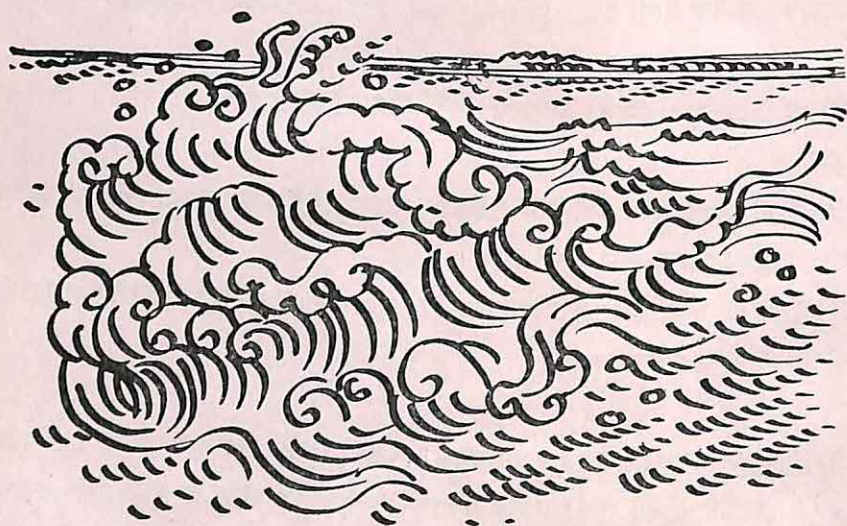
কালই এখান থেকে চলে যেতে হবে।

আবার কোন দেশে যাবেন, ভাবেন শালবাহু। বিছানায় ফিরে ভাবেন। রাজ-লক্ষ্মীর কথা কি মিথ্যে হবে? কতদিনে তাঁর বর ফলবে কে জানে?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েন শালবাহু। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন। সেই বিরাট নদী। সেই ফুঁসে ওঠা ঢেউ, সেই ঢেউয়ে নিজেও তলিয়ে গেছেন।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল। বন্দিদের গানে। আশ্চর্য, সেই পরিচারিকা না? রাজকুমারীর সখী? কাল যে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল? ধড়মড় করে উঠে বসলেন শালবাহু।

শুনুন।

রাজকন্যের সখী এঘরে এল। মৃদু পায়ে। হাতের বীণ নামিয়ে। চীনাংশুকের পরদা সরিয়ে।

কি বলবেন তাঁকে শালবাহু? ঘুমচোখ রগড়ে নিলেন দুহাতে। জানেন, কাল একটা স্বপ্ন দেখেছি। অদ্ভুত স্বপ্ন। আপনারা যেন কোথায় চলেছেন। মানে, আপনি আর আপনাদের রাজকন্যে।

তারপর?

আপনার হাতে শাঁখ-চন্দন-ফুল। রাজকন্যের হাতে থালায় ভরা ফুল আর মালা। দুজনে চলেছেন। আমিও পিছু পিছু। হঠাৎ একটা নদীর ধারে এলেন। ভীষণ একটা নদী। এই বড় বড় ঢেউ। তার মধ্যে বলা নেই কওয়া নেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন আপনারা।

শালবাহু বলে যান। তার চোখে চোখ রেখে।

কোথায় তলিয়ে গেলেন নিমেষে।

পরিচারিকার ভুরু কাঁপে।

ও কিছু নয়। স্বপ্নই। আমরা মরতে যাব কোন দুঃখে। আপনার জন্যে ভাল সরবৎ আর ডাবের ব্যবস্থা করি।

তাই ত। শালবাহু ভাবেন। সত্যিই স্বপ্ন নাকি?

আবার রাত্রি এল। আংটিটি পরলেন শালবাহু। আবার তেমনি তাদের পিছু পিছু যাওয়া।

জলে ঝাঁপ দিয়েও ওরা ফিরে এসেছে। ফুঁসে ওঠা ঢেউয়ের হাত থেকে।

শালবাহুও ঝাঁপ দেবেন। ভয় পাবেন না। মনে মনে পণ করলেন।

দুই সখী দেউড়ি পেরিয়ে এলেন। ইতিউতি চেয়ে। পিছনে অদৃশ্য শালবাহু।

যেতে, যেতে, যেতে,

সেই নদী, সেই ফুঁসে ওঠা ঢেউ।

বিপাশাকুমারী ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। সখীও।

এক নিমেষে তলিয়ে গেলেন ঢেউয়ে।

দম বন্ধ করে তিনিও
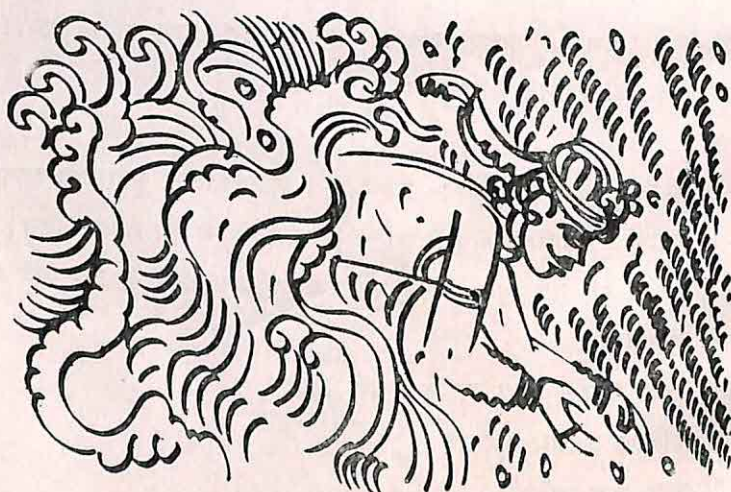
এ কি মায়াবিনী মেয়ে? তা হোক, শেষ অবধি দেখবেন শালবাহু।

তিনিও ঝাঁপ দিলেন। চোখ বুঁজে। দম বন্ধ করে।
আশ্চর্য, এতটুকু জল লাগল না গায়ে। সামনে দিব্যি পথ। শুকনো, খটখটে। পিছনে, আশেপাশে, মাথার উপরে টলটলে জল। একটু পরে তাও মিলিয়ে গেল। আশ্চর্য।
থালায় ভরা ফুল নিয়ে, বিনি সুতোর মালা নিয়ে, চন্দনের বাটি নিয়ে চলেছেন বিপাশাকুমারী। চলেছেন তাঁর সখী। চলেছেন শালবাহু। পিছু পিছু। অদৃশ্য হয়ে।

যেতে, যেতে, যেতে,
একি, ভোর হয়ে গেল নাকি? না ত, ভোর ত নয়।
এক মাঠ। মাঠের পরে এক বন। সেই বনে আগুন লেগেছে। লকলক করছে আগুন, আকাশ ছুঁয়েছে।
ধোঁয়ায় আর গনগনে হাওয়ায় কাছে যাওয়া দায়। ছাই উড়ছে। চারিদিকে পোড়া পোড়া গন্ধ। আগুনের তাপে কি সব ফাটছে বনে। ফটাফট আওয়াজে ঝালা-পালা কান।
বিপাশাকুমারী তবু চলেছেন। সখীকে নিয়ে। যেন কিছুই হয়নি। কিছু নেই সামনে।

এ আগুনও তবে নদীর মত মায়া? দেখা যাক।
শালবাহু মন ঠিক করেছেন। দম বন্ধ করে চোখ বুঁজে তিনিও এগিয়ে গেলেন। আশ্চর্য, এতটুকু আঁচ লাগল না গায়ে।
সামনে শিশির ভেজা পথ। ভিজে ভিজে ঘাসের সোঁদা সোঁদা গন্ধ। পিছনে আশে-পাশে, মাথার উপর লকলকে আগুন। আশ্চর্য।
একটু পরে তাও মিলিয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

বিপাশাকুমারী চলেছেন সখীকে নিয়ে।

চলেছেন শালবাহ। পিছু পিছু। অদৃশ্য হয়ে।

যেতে, যেতে, যেতে,

সামনে এক মস্ত মন্দির।

পঞ্চরত্ন মন্দির। তার পঞ্চশীর্ষ আকাশ ছুঁয়েছে। দুজনে মন্দিরে ঢুকলেন। শাল-বাহুও। দুই সখী দীপ জ্বাললেন। ধূপ জ্বাললেন। ধুনোর ধোঁয়ায় ম ম হল দেব-মন্দির। বেদীর উপর শিব ঠাকুরের মূর্তি। তাকে সাজালেন ফুলে মালায়। তারপর ধ্যানে বসলেন বিপাশাকুমারী। কতক্ষণ ধরে পুজো চলল। এক সময় চোখ খুললেন বিপাশাকুমারী।

ঠাকুর-প্রণাম করে বললেন, ঠাকুর, কতদিনে আমার সাধনা সফল হবে? মনের মত স্বামী আর কবে পাব? আমার সত্যি পরিচয় ত কেউ জানল না আজও। কবে শেষ হবে অভিশপ্ত অপ্সরার এই মানুষের জীবন?

ঘরময় কিসের যেন অপূর্ব গন্ধ। পুজোর বেদী কেঁপে উঠেছে। মেঘের গলায় কে বলছে,

তোর সাধনায় আমি খুশি হয়েছি। তোর সত্যি পরিচয় জেনেছে যে মানুষ, সে তোর সামনেই আছে। তারই গলায় দে তোর বরমাল্য। এতদিনে দেবরাজ ইন্দ্রের অভিশাপের ফল শেষ হতে চলল। মুক্তির পথ পেলি। কিছুদিন মানুষের ঘর করবি সুখে শান্তিতে। তারপর আবার তুই অপ্সরা হবি। মানুষের জীবন শেষ করে ফিরে যাবি স্বর্গে।

সেই অপূর্ব গন্ধ, সেই মেঘের মত স্বর মিলিয়ে গেল। ইতিউতি চাইলেন রাজ-কন্যে বিপাশাকুমারী। হাতে তাঁর বরমাল্য। চন্দন মাখা বিনি সুতোর মালা।

শালবাহু সামনে দাঁড়ালেন। হাতের আংটি খুলে। বিপাশাকুমারীর হাতে কেঁপে উঠল মালা। সখী পিছন থেকে শাঁখ বাজালেন।

শালবাহুর গলায় মালা। বিপাশাকুমারীর মুখে হাসি। ঝরঝর করে কয়েকটা মানিক গড়িয়ে পড়ল মন্দিরের মেঝেয়।

পিছন থেকে শাঁখ

ফুরিয়ে
যাওয়ার
কথা
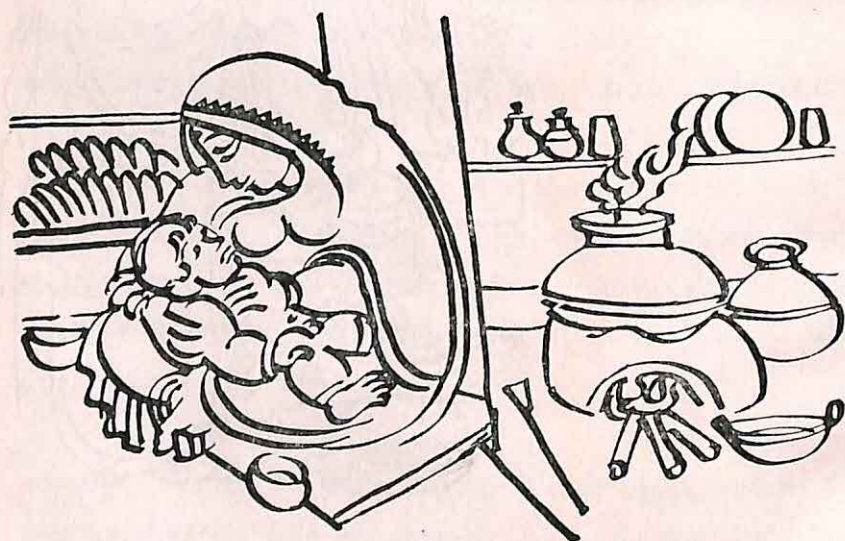
এক ছিল রাখাল। আর তার বউ। আর তার ছেলে। আর একটা গরু। রাখালের নাম রাখাল। বউএর নাম রাখালবউ। ছেলের নাম রাখালছেলে। গরুটার নাম গরু।

রাখালবউ রাঁধেবাড়ে। রাখাল খেয়ে দেয়ে গরু চরাতে যায়। রাখালছেলে খায়দায়, খেলে বেড়ায়।

একদিন হয়েছে কি, রাখালবউ ছেলেকে একটা নাড়ু খেতে দিয়েছে। রাখাল-ছেলের বায়না, সে একটা খাবে না। কিছুতেই না। আমাকে পাঁচটা, সাতটা, তিনটে দিতে হবে।

আর কোথায় পাব। রাখালবউ বলে। আর ত নেই।

ছেলের গোঁ তবু থামে কই?

খাবি ত খা, না খাবি ত না খা। রাগ করে বলে রাখালবউ। চলে যায় নাড়ুটা রেখে। শালপাতার ঠোঙায়। নিজের কাজে মন দেয়। রাখালছেলে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। নাড়ুটা ছুঁড়ে ফেলে।

এদিকে হয়েছে কি, এক ছিল ফাটল। ঘরের কোণে। সেই ফাটলে পিঁপড়েদের বাসা। পিঁপড়েদের এক মোড়ল ছিল। তার নাম মোড়ল। মোড়ল নাড়ুর বাস পেল। শুঁড় উঁচু করে দেখল। নাক উঁচু করে শুঁকল। উঁকি মেরে দেখল শালপাতায় নাড়ু। মোড়ল ডাক দিল। হাঁক পাড়ল।

ওরে কে কোথায় আছিস। লিট্‌কু, পুবলি, টুংচি বুবুল শিগগীর আয়। নাড়ু খাবি চল। সবাইকে খবর দে।

পিলপিল করে ওরা বেরিয়ে পড়ল। মোড়ল আর তার দলবল। দেখতে না দেখতে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল নাড়ুটার উপর। চেটে দেখল, শুঁকে দেখল, চেখে দেখল, কামড়ে দেখল কুটকুট। কেটে নিয়ে চলল কেউ কেউ। কেউ কেউ শুধু ঘুর ঘুর করল আশপাশ।

রাখালছেলে আগে দেখতে পায়নি। এবার দেখতে পেল ওদের। একটা শুধু নাড়ু, তাও খেয়ে নেবে পিঁপড়ে? রেগে মেগে মারল এক থাবড়া।

থাবড়া খেয়ে কত পিঁপড়ের যে পা ভাঙল, শুঁড় খসল, ঘাড় গেল মটকে। পিঁপড়ের দলে হই চই। ছুটোছুটি। কেউ লুকোল শালপাতার নিচে। কেউ তখনও মুখ ডুবিয়ে নাড়ুতে।

মোড়ল সাত তাড়াতাড়ি উঠল শালপাতার ডগায়। হাত, পা নেড়ে বলল চেঁচিয়ে। কেউ পালিও না তোমরা। ও কেন মারবে শুধু শুধু? আমরা ওকে কিছু করিনি। ওর ফেলে দেওয়া নাড়ুটাই শুধু খেতে চেয়েছি। ও কেন মারবে শুধু শুধু। চলো আমরা এর শোধ নেব। কামড়াব কুটুস কুটুস।

যেই না বলা, পিঁপড়েরা ঘুরে দাঁড়াল। নতুন সাহসে। লিট্‌কু, টুংচি, পুবলির দল। মোড়ল আবার চেঁচিয়ে বলল, কামড়াও ওকে, হাতে, পায়ে, গায়ে যেখানে খুশি। কামড়াও কুটুস কুটুস।

মোড়ল কামড়াল আগে। রাখালছেলের পায়ের আঙুলের ফাঁকে। দেখতে দেখতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। পা বেয়ে উঠল, হাত বেয়ে উঠল, পিঠ বেয়ে উঠল। কামড়াল কুটুস, কুটুস, কুটুস। রাখালছেলে আর কটাকে মারবে। তার হাঁউ মাঁউ বেড়ে গেল। বেড়ে গেল দাপাদাপি। আর সে কি কান্না।

রাখালবউ ছুটে এল রান্না ফেলে। কোলে নিল। ঝেড়ে ঝুড়ে দিল পিঁপড়ে। রাখালছেলের কান্না তবু থামে না। থামবে কি? দুঃখু কি একটা! নাড়ুর বদলে কামড় খেয়েছে। কামড় খেয়ে জ্বালা ধরেছে।

ওকে থামাতে না পেরে রাখালবউ এর রান্না আর হলো না। রাখালকেও ভাত দিতে পারল না। ভাত না পেয়ে রাখাল গরু চরাতে গেল না। চরতে না পেয়ে গরু আর কি করে? নটে গাছটি মুড়িয়ে খেল।

আমার কথাটিও ফু-র-লো।
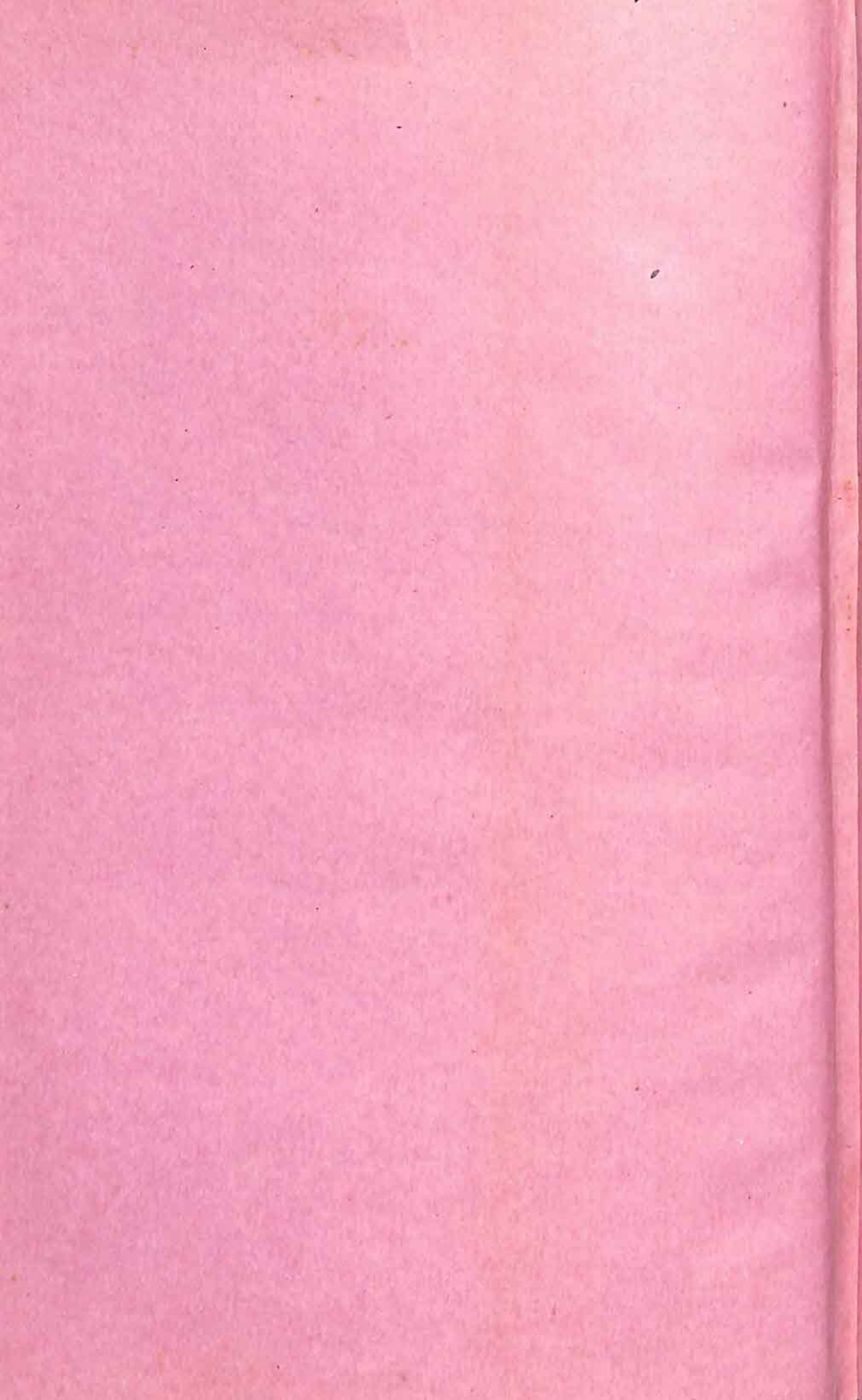
শিশুমনের কল্পনাকে উস্কে দিতে, তাদের দেখবার চোখকে বিস্তৃত, গভীরতর করতে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুড়ি নেই। তাঁর কম্পোজিশনের মাধুর্য মনে করিয়ে দেয় নন্দলাল বসুকে, তাঁর রেখার সাবলীলতা বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়কে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে লোকশিল্পের সহজিয়া রূপটি যুক্ত করে রামানন্দ হয়ে উঠেছেন অনবদ্য, অনন্য।

বইটির প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্রগুলিতে প্রচ্ছন্ন পরিহাস, নাটকীয়তা এবং মমত্বের এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে। বাচ্চাদের নিজস্ব রসদৃষ্টিকে তা শুধু প্রখর করবে না, গল্পগুলির স্বাদ গ্রহণে, চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টিতেও তা সার্থক অনুঘটক হতে পারবে ।

□

ISBN 81-85109-89-3

লেখক পেশায় শিক্ষক। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, লেখালেখি কিম্বা ইংরাজী ভাষা শেখানো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ছাড়াও সমাজ বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা এবং শিশুসাহিত্য নিয়ে তাঁর সমান উৎসাহ। তবে শিশুসাহিত্যই লেখ-কের প্রথম প্রেম। ১৯৪৩ সালে রংমশালে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মেঘের দেশের পরী' ছিল একটি মৌলিক রূপকথা। তাঁর এই প্রথম প্রকাশিত বইটিও রূপকথা নিয়ে। ইতিমধ্যে নানা পত্রপত্রিকায় বাচ্চাদের জন্যে লিখেছেন। সংগ্রহ ও গবেষণা করেছেন অনেক বেশি। শিক্ষাবিদ ও উপদেষ্টা হিসেবে দীর্ঘকাল বিদেশে থাকবার সময় সে সংগ্রহ সমৃদ্ধ হয়েছে, গবেষণাও পরিণত হয়েছে।

লেখকের পরবর্তী প্রকাশন তালিকায় আছে ঃ

- দেশবিদেশের রাক্ষস খোক্কস
- নানান্ দেশের উপকথা
- কেউ ছোট নও

প্রচ্ছদ ও রেখাচিত্র ঃ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ঃ কবিতা ঘোষ, পূলা পাবলিকেশনস্, কলকাতা-৬৪

সহযোগী প্রকাশক ও পরিবেশক ঃ
নয়া প্রকাশ, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

পনের টাকা

বাংলাদেশ টাকা ঃ তিরিশ

US $ 4·50 £ Stg 2·95 net

ISBN 81 - 85109 - 89 - 3